আগে কহ আর

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

টি. এস. বি. প্রকাশন

৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

প্রকাশক
বি, ভট্টাচার্য্য
টি, এস, বি প্রকাশন
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট
সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রাকর
শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র রায়
১১৬, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

দাম ৩.০০

AGE KAHA AR.
Achintya Kumar Sengupta.
Price Rs. 3·00

গল্পক্রম ঃ

স্বভাবের স্বাদ

ইস্কুলটা খুঁজে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হল না ইন্দিরার।

আর, হ্যাঁ, ঐ সংলগ্ন বাড়িটাই তো হস্টেল।

স্টেশন থেকে সটান চলে এসেছে। কত দূরের কত দিনের পথ। সর্বাগ্রে দেখা করা চাই। তারপরে অন্য কথা, অন্য কাজ। নিজের চিন্তা। নিজের সুখ-দুখ।

ভরা-ভর্তি ইস্কুল হচ্ছে এখন। ভিতরের কম্পাউণ্ডে কোনো ছেলেই ঘুরছে না এদিক-ওদিক। গেটে দারোয়ান মোতায়েন।

'টিফিন হয় না ইস্কুলে?' জিজ্ঞেস করল ইন্দিরা।

প্রশ্নটা কেমন অদ্ভুত লাগল। টিফিন ছাড়া ইস্কুল হয় নাকি? আর, সকল প্রশ্ন ছেড়ে প্রথমেই টিফিনের প্রশ্ন? কাউকে কিছু খাওয়াবে নাকি? খাওয়াবে তো সঙ্গে বাক্স-বাটি কি অন্য কোনো বাসন-কোসন দেখছি না কেন?

'টিফিন হয় সেই দেড়টায়।' বললে দারোয়ান।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল ইন্দিরা। এখন তো মোটে বারোটা বেজে কুড়ি।

'কতক্ষণ টিফিন?'

'আধঘণ্টা।'

'এই আধঘণ্টা ছেলেরা কী করে?'

হাসল দারোয়ান। 'কী আর করে! খায়।'

'আধঘণ্টা ধরেই কি খায়?'

'তা কি আর খায়! খেতে বড়-জোর দু-পাঁচ মিনিট। বাকি সময়

খেলে, ছুটোছুটি করে। ছেলেদের দুষ্টুমির কি অন্ত আছে?' নিজের মনেই হাসল দারোয়ান।

'গেটের বাইরে এই রাস্তায় আসে না?'

'না না, রাস্তায় যাবে কী! আমি তবে আছি কী করতে?'

'কিন্তু যখন স্কুলের শেষ ঘণ্টা পড়ে? ছুটি হয়ে যায়?'

'বা, তখন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে বৈ কি। যারা পায়ে হেঁটে যাওয়া-আসা করে তাদের রাস্তা ছাড়া গতি কী! যারা বাসে যায় তারাও সময়-সময় রাস্তায় নামে, কিন্তু তা বাসে উঠতে। বাস সব-সময় ঢোকে না কম্পাউণ্ডে।'

'আর যারা হস্টেলে থাকে?' কৌতূহলে চঞ্চল হল ইন্দিরা।

'তারা কম্পাউণ্ড পেরিয়ে হস্টেলে ফিরে যায়।'

'তারা বুঝি রাস্তায় আসে না?'

'না। হস্টেলের পথ স্কুলের পিছন দিয়ে। কম্পাউণ্ডেরই মধ্যে। এই রাস্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। দেখুন না ঐ বাগানের ধার দিয়ে।'

তা হলে আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী। ভিতরে ঢুকি। খোঁজ নিই।

তবু দোনামনা করতে লাগল ইন্দিরা।

দারোয়ানের কাছে প্রথম থেকেই একটু অদ্ভুত লাগছে। এত সব খবরাখবর তার কাছে কেন? দেখতে-শুনতে তো বেশ ভদ্র, সম্ভ্রান্ত মহিলা। সোজা ভিতরে ঢুকে অফিসে খোঁজ নিলেই হয়। আর জানবার বিষয়ই বা কী! কোন ছেলে রাস্তায় নামে! কোন ছেলে নামে না।

'আপনার কি কারুর সঙ্গে দেখা করবার দরকার আছে?' দারোয়ান এগিয়ে এল এক পা।

'হ্যাঁ, তারই জন্যে তো কলকাতা থেকে আসছি।'

'আজ এসেছেন?'

'হ্যাঁ, এই তো, এইমাত্র। এই সকালের ট্রেনে। আর স্টেশন থেকে সোজা এই ইস্কুলে।'

'খুব জরুরি নিশ্চয়ই।' কণ্ঠস্বরে সহানুভূতির টান আনল দারোয়ান। 'তবে মিছিমিছি বাইরে দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছেন কেন? ভিতরে ঢুকে সোজা রেক্টরের সঙ্গে দেখা করুন।'

তা ছাড়া আর উপায় কী। গেট পেরিয়ে ভিতরে কয়েক পা এগুলো ইন্দিরা। পরমুহূর্তেই ফিরে এল।

দারোয়ানকে বললে, 'দারোয়ানজী, তুমি কৃপা করে আমাকে একটা ছোট্ট উপকার করতে পারো? ঠিক এক্ষুনি না হয়, টিফিনের টাইমে?'

প্রায় আকাশ থেকে পড়ল দারোয়ান। 'কী উপকার?'

'তোমাকে আমি ভারী হাতে বকশিস দেব।' ইন্দিরা গলা নামাল।

'আরে, আগে কাজটা কী তা তো বলবেন।'

'কাজটা বিশেষ কিছুই নয়। একটি ছেলের সঙ্গে আমার একটু দেখা করিয়ে দিতে পারবে?' দুচোখে মিনতি নিয়ে তাকাল ইন্দিরা।

'ছেলের সঙ্গে? কে ছেলে?'

'নাম বিজন। বিজন সরকার। বিজু বলে ডাকে।'

'বিজন নামে কত ছেলে আছে তার ঠিক কী।' বিরক্ত হচ্ছে দারোয়ান।

'এ খুব ছোট। ছ-সাত বছর মোটে বয়েস। নিচুর দিকে পড়ে নিশ্চয়ই। খুঁজে বার করতে তোমার কষ্ট হবে না। আর, আরো তোমাকে বলে দিচ্ছি।' ইন্দিরার স্বরে ব্যাকুলতা জাগল। 'দেখবে বাঁ চোখের কাছে গোল-মতো ছোট্ট একটা আবছা জট আছে। হাসলে কী মিষ্টি যে দেখায়—' চোখের কোণ চকচক করে উঠল।

'ছেলে চিনে আমি ক্লাস থেকে তাকে তুলে নিয়ে আসব?' দারোয়ান প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসল। 'ছেলে আমার সঙ্গে আসবে কেন? আর সে এলেও ক্লাসের মাস্টার তাকে আমার হাতে ছেড়ে দেবে কেন? জিজ্ঞেস করলে আমি কী বলব?'

'আচ্ছা এখন না হোক, টিফিনের সময়? যখন সব এলোমেলো হয়ে যাবে? চারদিকে সব ছুটোছুটি হুটোপাটি পড়ে যাবে? তখন?'

'ততক্ষণ আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

'থাকব।'

তা আর বেশি কথা কী! মনে মনে বললে ইন্দিরা। রাত ভোর করে দিতে পারি, যদি বলো। যদি একবার বলো তাকে সত্যি এনে দেবে। দাঁড় করিয়ে দেবে আমার চোখের কাছে।

আচ্ছা, সত্যি যদি বিজু আসে, দাঁড়ায় তার নাগালের মধ্যে? তাহলে কী হয়? বিজুই কি নিজের থেকে ছুটে এসে তার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, না, সে ছুটে গিয়ে তাকে দুই ক্ষুধিত বাহুর মধ্যে আঁকড়ে ধরবে প্রাণপণে? তারপর কী হয়? তারপর কি সে কিছুক্ষণ পরে আলিঙ্গন শিথিল করে দেয়, ছেড়ে দেয়, চলে যেতে দেয় বিজুকে? না কি তাকে তেমনি বুকে করে ছুট দেয় রাস্তা দিয়ে, মাঠ দিয়ে, পাহাড়-নদী পেরিয়ে —তাকে তার কলকাতার বাসায় নিয়ে আসে?

যদি ছেলেটাকে খুঁজে পাই, তখন কী বলব তাকে? কে ডাকছে বলব? জিজ্ঞেস করলে দারোয়ান।

ইন্দিরার চোখ ছল ছল করে উঠল, ধরা গলায় বললে, 'বলবে তার মা ডাকছে।'

'মা? আপনি মা?' দারোয়ান প্রায় বসে পড়ল মাটিতে। 'তবে আপনার কিসের ভাবনা? সোজা গিয়ে ছেলেকে দেখে আসুন।'

ইন্দিরার যেন তবু নড়বার নাম নেই।

তবে নিশ্চয়ই পাগল, নয় তো অভিসন্ধি মন্দ। নইলে যদি মা-ই হবে, তবে ছেলেকে দেখতে কথার এত কাঠখড় পোড়াতে হয় কেন? কেনই বা হয় বকশিস কবলাতে? কী ব্যাপার? ছেলেটাকে চুরি করে নিয়ে যেতে চায় নাকি?

পিছিয়ে গেল দারোয়ান। ইস্কুলের এক কেরানিবাবুকে বাইরে বেরুতে দেখে তাড়াতাড়ি বললে, 'দেখুন দেখি ইনি কী চান।' বলেই লক্ষ্য

করলে ইন্দিরাকে। 'যান, ওঁর সঙ্গে যান। উনিই পারবেন সব ব্যবস্থা করতে। আমি শুধু দারোয়ান, গেটকিপার।'

'আসুন।' এগিয়ে এসে বললে কেরানি।

আর লুকোবার উপায় নেই। কেরানিকে অনুসরণ করল ইন্দিরা।

না, লুকোবার আছে কী! ইন্দিরা তো সরকারীভাবেই আবেদন করতে এসেছে। নইলে কলকাতা থেকে এতটা পথ চলে আসা তো চারটি-খানি কথা নয়। শুধু একটা অলস ছেলেখেলা খেলবার জন্যে কি কেউ এত কষ্ট করে? নায় না, খায় না, চোখের দুপাতা একত্র করে না?

শুধু দূর থেকে একটু দেখেই চলে যাব? তাকে ছোঁব না, ধরব না, আদর করব না? কথা কইব না তার সঙ্গে? তার মুখের একটু ডাক শুনব না?

অফিস-ঘরে এসে বসল ইন্দিরা। কেরানিকে বললে তার বক্তব্য।

'কী নাম বললেন? বিজন সরকার?' খাতাপত্র ঘাঁটতে লাগল কেরানি। 'কোন ক্লাসে পড়ে ঠিক বলতে পারেন না? নতুন ভর্তি হয়েছে বলছেন? ছ-সাত বছর বয়েস? হ্যাঁ, পেয়েছি। বাবার নাম সুদক্ষিণ সরকার? হ্যাঁ, এই তো নতুন ভর্তি হয়েছে, প্রিপেরেটরি ওয়ান্-এ পড়ে। হস্টেলে থাকে। আজ এসেছে স্কুলে। ক্লাসে আছে।'

'ক্লাসে আছে?' ইন্দিরার দুচোখ লালসায় জ্বলজ্বল করে উঠল। 'ক্লাসটা কোথায়?'

'এই তো নিচেই। এ ঘরটার দুখানা ঘর পরে।' বললে কেরানি।

'এত কাছে?' ইন্দিরা যেন এখুনি ছুটে চলে যাবে সে ঘরে।

'দাঁড়ান, রেক্টরকে খবর দিই।' কেরানি উঠল চেয়ার ছেড়ে।

ইন্দিরার সমস্ত শরীরে যে উদ্যোগের সুর বেজে উঠেছিল সহসা তা স্তিমিত হয়ে গেল। ক্লান্তিতে ঢলে পড়ল চেয়ারে। কেরানি যেমন উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে সেও তো পারত উঠতে। যেতে পারত পিছু-পিছু। দু পা এগুলেই তো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে পেত বিজুকে। কী না জানি করছে এখন বিজু। মুখখানি কেমন করে রয়েছে। কোন দিক করে

রয়েছে। আশ্চর্য, কিছুতেই উঠতে পারল না ইন্দিরা। কী এক অবসাদ তাকে গ্রাস করে বসল। চলুন, আমিই যাচ্ছি রেক্টরের কাছে—বলে চালাকি করে দিব্যি ঢুকতে পারত ক্লাসরুমে। চোখ প্রথমে যার উপরে পড়ত, সন্দেহ কি, সেই তো তার বিজু, তার বিজুর চোখ দুটি।

হঠাৎ কতগুলি ছেলের কলরব শোনা গেল। কাছাকাছি কোনো ঘর থেকেই উঠেছে সে গোলমাল। কান খাড়া করল ইন্দিরা। কোলাহলের ঐ ছোট ক্ষীণ তন্তুটা কি বিজুর গলার নয়? না, না, ও বিজুর হবে কী করে? বিজুর কি এখন আর কোলাহল করবার মন আছে?

রেক্টর এল। বাঙালীই বটে। কিন্তু কিরকম আঁট-সাঁট কাট-কাট চেহারা।

'আপনিই মিস্টার রায়?' উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল ইন্দিরা।

'হ্যাঁ, বসুন।' বসতে বলে জ্ঞানেশ রায় বসল মুখোমুখি। 'আপনি মিস্টার সুদক্ষিণ সরকারের স্ত্রী?' একটু বা তাকাল পর্যবেক্ষকের চোখে।

চোখ নামাল ইন্দিরা। বললে, 'হ্যাঁ, প্রিপেরেটরি ওয়ান-এর বিজন সরকারের মা।'

খাতাপত্র কিছু দেখতে হল না জ্ঞানেশের। বললে, 'হ্যাঁ, বুঝেছি। কী চান আপনি?'

বিষাদমাখানো আয়ত চোখ তুলল ইন্দিরা।

'ছেলের সঙ্গে দেখা করতে চান?'

ইন্দিরার চোখ সম্মতিতে প্রশান্ত হল।

'শুনুন।' শাসকের মত গম্ভীর মুখ করল জ্ঞানেশ। 'আমি দুঃখিত, আপনাকে হতাশ করতে হচ্ছে। বিজন সরকারের সঙ্গে আপনার দেখা হওয়া অসম্ভব।'

'অসম্ভব?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ইন্দিরা।

'অসম্ভব মানে এই ইস্কুলে অসম্ভব।'

'তবে ওর হস্টেলে?'

শুষ্ক রেখায় হাসল জ্ঞানেশ। 'স্কুল ইনক্লুডস হস্টেল। আমি হস্টেলেরও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।'

'আমি মা, আমি আমার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে পারব না?' চাউনিতে একটু তিরস্কার মাখাল ইন্দিরা। ভঙ্গিটাও বা তর্কের মত করল।

'আপনি বিজনের মা এ আমি কোশ্চেন করছি না—'

'মানে? আমি বিজনের মা নই?'

'বললাম তো সে-পয়েন্ট আমি তুলছি না। যদিও আইনত পারতাম তুলতে। আর, তুললে আরো বিব্রত হতেন আপনি। ক্রেডেনশিয়ালস দেখাতে হত।'

'ধন্যবাদ।' যুক্তির সামনে পড়ে থতমত খেল ইন্দিরা। বললে, 'আমি যদি মা বলে গ্রাহ্য হই তা হলে আমার সন্তানকে আমার দেখতে চাওয়ায় বাধা কী?'

'চাওয়ায় বাধা নেই, পাওয়ায় বাধা।'

'কেন, বাধা কেন?'

'ওয়ার্ডের যে গার্ডিয়ান একমাত্র সে-ই দেখা করতে পারে। আর কেউ নয়।'

'মা সন্তানের অভিভাবক নয় বলতে চান?'

'গার্ডিয়ান বলতে বুঝছি অফিসিয়াল গার্ডিয়ান। মানে, রেকর্ডেড গার্ডিয়ান—মানে, আমাদের বইয়ে যে গার্ডিয়ান বলে লিপিবদ্ধ—'

'কে সে?'

'মিস্টার সুদক্ষিণ সরকার। ওয়ার্ডের যিনি বাবা—'

'শুধু তিনি কী করে হন?'

'আইনের চোখে তো তিনিই প্রকৃত গার্ডিয়ান। এক্ষেত্রে তিনিই এসে ছেলেকে ভর্তি করে দিয়ে গেছেন, ইস্কুল আর হস্টেল দুয়েরই যাবতীয় খরচ বহন করেছেন ও করছেন—সো অন অল কাউন্টস, বিধিতে ও ব্যবহারে তিনি, মানে, সুদক্ষিণবাবুই একমাত্র গার্ডিয়ান।'

'তা হলে একমাত্র বাবাই ছেলেকে দেখতে পাবে ?'

'হ্যাঁ, তাই ইস্কুলের নিয়ম। আমরা ছেলেকে বাপের কাছ থেকে পেয়েছি, তাই আমরা শুধু বাবাকে চিনি, তাই শুধু বাবাকেই এলাউ করব ছেলের সঙ্গে দেখা করতে—'

'মাকে করবেন না ? মার কোনো অধিকার নেই ?' চোখের দৃষ্টি রুক্ষ হল ইন্দিরার।

'অন্যত্র কী অধিকার আছে তাতে আমরা আগ্রহান্বিত নই কিন্তু স্কুলে, বর্তমান অবস্থায় নেই বলেই মনে হচ্ছে।'

'মাকে দেখা করতে দেবেন না, এটা ন্যাচারেল জাস্টিস ?'

'এটা ডিসিপ্লিন। তাছাড়া আরো একটু কথা আছে।' জ্ঞানেশ চোখের দৃষ্টিটাকে একটু বাঁকা করল।

'কী কথা ?'

'ছেলের গার্ডিয়ান, মানে, যিনি ছেলেকে এখানে ভর্তি করে দিয়ে গেছেন, তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ আছে যে ছেলের মা যদি আসে বা ছেলের মা বলে পরিচয় দিয়ে কেউ আসে, তার হাতে যেন ছেলেকে ছেড়ে না দিই। সে তো দূরের কথা, এমন কি, তাকে যেন ছেলেকে দেখতেও না দিই।'

'এতদূর !' জ্বলে উঠল ইন্দিরা।

'শুধু মা নয়, যে কোনো আত্মীয়, সবাই ব্যানড। একমাত্র যিনি গার্ডিয়ান, মানে স্বয়ং মিস্টার সরকারই পারবেন শুধু দেখতে শুনতে, তদারক করতে। তবে কাউকে যদি তিনি লিখে অথারাইজ করে দেন সে তাঁর পক্ষে এসে দেখে যেতে পারে। বেশ তো, স্বচ্ছন্দ সমাধানের স্বরে বললে জ্ঞানেশ, 'আপনি সুদক্ষিণবাবুর কাছ থেকে একটা রিটন অথরিটি নিয়ে আসুন, আমি দেখা করার বন্দোবস্ত করে দেব।'

'অথরিটি দেবার লোক এখানে কোথায় ?'

'না, আমি মিন্ করছি, চিঠি লিখে ডাকে আনান সেই ছাড়পত্র। এই ধরুন, সামান্য তিন চার দিনের ওয়াস্তা।'

'ওরে বাবা !' শিউরে উঠল ইন্দিরা। 'তিন-চারদিন এখানে

থাকব কোথায়? থাকবই বা কী করে? আজ রাত্রের গাড়িতেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। ছুটি নেই।'

'তা কী করব বলুন। আমি অত্যন্ত দুঃখিত।'

'আচ্ছা, আমি ওকে একটু দূর থেকে দেখতে পারি না?' করুণ সিক্ত স্বরে বললে ইন্দিরা, 'সত্যি বলছি, আমি ওকে ছোঁব না, ধরব না, কোলে নেব না, কথা কইব না, ডেকে উঠব না, শুধু একটু চোখের দেখা দেখব—তাও কি সম্ভব নয়?'

'কোত্থেকে দেখবেন? আর কখন?'

'এই ধরুন, খানিক পরে টিফিন হবে ইস্কুলে। ছেলেরা সব মাঠে বারান্দায় বেরিয়ে পড়বে, ছুটোছুটি করবে, তখন ভিড়ের মধ্য থেকে চোখ ঠিক খুঁজে নেবে বিজুকে—'

রেক্টর শব্দ করে হেসে উঠল। বললে, 'বিজু খুব শান্ত, খুব বাধ্য ছেলে। টিফিন খাবার পরেও সে চুপচাপ ঘরের মধ্যে বেঞ্চিতে বসে থাকে। তার বাবা তাকে বলে গেছে, স্কুলের বাইরে যাবে না। সে তাই প্রাণপণে মেনে চলে। এতটুকু অবাধ্য হয় না। তার কাছে ক্লাস-রুমটাই স্কুল।'

'বেশ তো, তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে একটু দেখব ওকে।' ইন্দিরা তার অবসন্ন দৃষ্টি চাইল একটু উজ্জ্বল করতে। 'সামান্য অতটুকুও তো পারেন এলাউ করতে?'

'না, মাপ করবেন। অত্যন্ত দুঃখিত।' বিনয়ে আরো ঘনীভূত হল রেক্টর। 'অতটুকুও পারি না।'

'অতটুকুও নয়?' ক্রোধে চেয়ারের হাতলটা মুঠো করে চেপে ধরল ইন্দিরা। 'এ কী বর্বরতা!'

'আপনি খুব নিষ্ঠুর ভাষা ব্যবহার করছেন, কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার হৃদয়ঙ্গম করুন। আপনি নিজেকে আমার জায়গায় প্লেস করুন আর আমাকে দাঁড় করান প্রার্থী হিসেবে। যেখানে বিশেষ একজনের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বারণ করা আছে, তাকে আপনি কী করে প্রশ্রয় দেন?'
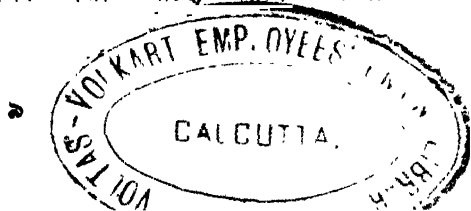
'বাঃ, চোখের দেখা দেখতে দিই বইকি।' টেবিলের উপর সামান্য ঝুঁকে পড়ল ইন্দিরা। 'বিজু যদি কোথাও বেড়াতে যায়, বাইরে বেরোয়, তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখা, দেখতে পাওয়া, আপনি ঠেকাবেন কী করে?'

'ঠিকই তো। বাইরের ব্যাপারে আমার কোনো দায়িত্ব নেই, পারব না ঠেকাতে।' কঠিন হল রেক্টর। 'কিন্তু, স্কুলের মধ্যে আমিই সর্বেসর্বা, অবাঞ্ছিতকে নিশ্চয়ই প্রতিরোধ করব।'

'খুব কৃতিত্বের পরিচয় দেবেন।' ব্যঙ্গে ঝাঁজিয়ে উঠল ইন্দিরা।

'শুনুন। ব্যাপারটা তো শুধু আপনার দেখা নয়, ওরও দেখা।'

'ওরও দেখা মানে?'

'আপনি ওকে দেখছেন আর প্রতি পলকে আশা করবেন ও-ও আপনাকে দেখুক, ওর চোখ পড়ুক এসে আপনার চোখে। বলুন, তাই চাইবেন না, আশা করবেন না? দেখা কি কখনো সম্পূর্ণ হয় যদি যাকে দেখছি সে আমাকে না দেখে?'

'আমি দূর থেকে দেখব—ও-ও যদি আমাকে একটু দূর থেকে দেখে, তাহলে ক্ষতি কী!'

'ক্ষতি কী! আপনাকে দেখলেই তো ও ভীষণ উত্তেজিত হবে। মা এসেছে বলে ছুটবে আপনার দিকে। কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে। তখন আপনি পারবেন সামলাতে? পারবেন দূরে থাকতে? মাঝখান থেকে ফল দাঁড়াবে কী! ফল দাঁড়াবে, ডিসিপ্লিন মেইনটেণ্ড হবে না। গার্ডিয়ান পই পই করে যা নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল তার ব্যতিক্রম হবে।'

দু'গালে দু'বিন্দু চোখের জল নেমে এসে পড়ি পড়ি করছে, ইন্দিরা বললে, 'বেশ, এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখব যেখানে ওর চোখ পড়বে না, ও ভাবতেও পাবে না ঘূণাক্ষরে।'

তবুও নরম হয় না জ্ঞানেশ রায়। বললে, 'দেখুন, এর মধ্যে আবার দৈবের অবকাশ আছে। আপনি হয়তো সতর্ক হলেন কিন্তু দৈবাৎ ও-পক্ষ হয়তো নড়ে চড়ে-উঠল, জায়গা বদলাল, দেখে ফেলল আপনাকে।

তখন সব মাটি। তাই দয়া করুন, কোনো চান্সই আমি নিতে পারব না। তা ছাড়া—'এ-পাশ ও-পাশ তাকাল জ্ঞানেশ।

'তা ছাড়া—' আরো কী আতঙ্কের কথা বলে বিবর্ণ মুখে তাকিয়ে রইল ইন্দিরা।

'তা ছাড়া আপনাকে নিয়ে ছেলেদের মধ্যে কোনো কথা ওঠে, কোনো গুঞ্জন শুরু হয় এটা বাঞ্ছনীয় নয়। কারু মা দেখা করতে এসেছিল, দেখা পায়নি—এই থেকে শুরু করে প্রশ্নটা শেষে দাঁড়াবে, কার মা, কার মা দেখা পেল না? ক্রমে উত্তরটা স্পষ্ট হবে, বিজুর মা; বিজুর মা দেখা করতে পারেনি তার ছেলের সঙ্গে—পারেনি মানে তাকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। শেষকালে কথাটা যদি বিজুর কানে ওঠে, বিজুর অবস্থাটা কী রকম হবে বলুন তো। আপনি যখন ওর মা তখন তো নিশ্চয়ই ওর মঙ্গল চাইবেন। সুতরাং আমি বলি কী', ঘড়ির দিকে তাকাল জ্ঞানেশ, 'আপনি বেশিক্ষণ স্কুলে আর থাকবেন না।'

'আমাকে চলে যেতে বলছেন?' ঘাড় বাঁকাল ইন্দিরা। 'যদি না যাই?'

'যদি না যান!' মূঢ়ের মতো চোখ করল রেক্টর। 'বিজুকে তাহলে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলব, আটকে রাখব। অন্তত যাতে ইস্কুলের ত্রিসীমায় তার অস্তিত্বের কোনো আভাস না থাকে। তাতে আপনার লাভ কী! শুধু ছেলেটারই দুর্ভোগ।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ইন্দিরা। পরাভূতের মত বললে, 'এরই জন্যে আমি কলকাতা থেকে ছুটে এসেছিলাম? আর স্টেশন থেকে সোজা ইস্কুলে? এইরকম একটা মমতাহীন, নৃশংস ব্যবহারের সম্মুখীন হব বলে?'

জ্ঞানেশ সমব্যথীর সুরে বললে, 'সত্যি যদি আসবার আগে চিঠি লিখে জানতেন ব্যাপারটা—'

চলে যাচ্ছিল ইন্দিরা, থামল। বললে, 'এই ব্যবহারের কোনো প্রতিকার নেই ভেবেছেন?'

'হয় তো আছে। কিন্তু পদ্ধতিটা যে কী তা বলতে পারব না।'

'পরামর্শ কেউ চাইছে না আপনার কাছে। দেখতেই পাবেন।' দরজার দিকে এগুলো ইন্দিরা।

'শুনুন। আপনি এমন ভাব করছেন যে আমিই নিষ্ঠুর—'

'তা ছাড়া আবার কী।'

'না, নিষ্ঠুর আপনার স্বামী।'

যেন টলে পড়ে যাবে ইন্দিরা, দরজাটা ধরে ফেলল।

যেতে যেতে আবার ফিরল। কান্নাকাঁপা গলায় বললে, 'বিজু কেমন আছে অন্তত এটুকু খবর আমাকে দিতে পারেন?'

'বিজু কেমন আছে এ প্রশ্নের তো একটাই শুধু উত্তর হতে পারে।'

'শুধু একটা উত্তর?'

'হ্যাঁ, বিজু ভালো আছে, স্ফূর্তিতে আছে, মা-বাবা বাড়ি ঘর সব ভুলে নতুন জীবন নিয়ে মেতে আছে—'

'অন্য উত্তর হতে পারে না কেন?'

'অন্য উত্তর হলেই তো বিপদ। যদি বলি, ও মন-মরা হয়ে আছে, কারু সঙ্গে মেশে না। ভালো করে, খায় না, খেলে না, খালি খালি মা-মা করে—'

আঁচলের প্রান্তে চোখ ঢাকল ইন্দিরা।

'আপনাকে একটা গাড়ি ডেকে দেব?'

'দরকার নেই।'

হৃতসর্বস্বের মত রাস্তায় নেমে এল ইন্দিরা।

কোথায় যায়। সুগতার কথা আগেও মনে ছিল, এখন আবার মনে পড়ল। তার স্বামী অনীশ একজিকিউটিভ লাইনের লোক, কিছু একটা সুরাহা করে দিতে পারে হয়তো।

খুঁজে খুঁজে সুগতাদের বাড়ি এসে পৌঁছুতে দুপুর গড়িয়ে গেছে।

সব শুনে সুগতা তো বিশ্বাসই করতে পারে না। মা তার ছেলেকে

দেখতে পাবে না এ কল্পনার বাইরে। বা, হুকুম জারি করলেই হবে ? ছেলে কি একলা বাপের ?'

'তুই কিছু ভাবিসনি। উনি ফিরুন অফিস থেকে, সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। চাইকি বিজুকে আজ আমাদের বাড়িতে এনে রাখব, তোর সঙ্গে কাটাবে রাতটা—'

আনন্দে ঝলমল করে উঠল ইন্দিরা।

'উনি বললে রেক্টর 'না' করতে পারবে এমন মনে হয় না।' শরীরে স্বামীগর্বের ঢেউ তুলল স্থগতা। 'মায়ের কাছে ছেলে থাকবে এর মধ্যে বেআইনি কী আছে ? ছেলেকে পেলে আজ রাত্রেই আর ফিরে যাবি না তো।'

'তা কি কেউ যায় ?' প্রতিমার মত মুখ করল ইন্দিরা। 'সবই তো এই সন্তানের জন্যে। তাকে পেলে আর কী চাই ?'

অফিসে খবর পাঠিয়ে অনীশকে তাড়াতাড়ি বাড়ি আনল স্থগতা। সব বললে সবিস্তার।

'এবার দ্রুত ব্যবস্থা করো। যে করে হোক মায়ে-পোয়ে দেখা করিয়ে দিতেই হবে। না হয় স্বয়ং রেক্টরসুদ্ধু বিজুকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এস।' স্থগতা বলল।

'তোমরাও চলো না সঙ্গে।' অনীশ বললে সাহস করে। 'যদি হয়ে যায় এই সুযোগেই হবে। সামান্য একটু চোখের দেখায় অনুমতি দিতে আপত্তি কী।'

তিনজনেই গেল হস্টেলে। তিনজনেই দাঁড়াল রেক্টরের সামনে।

'সামান্য একটু চোখের দেখায় অনুমতি দিতে আপত্তি,' জ্ঞানেশ বললে রুক্ষ স্বরে, 'যেহেতু বিজুকে বলা হয়েছে, বোঝানো হয়েছে, ওর মা নেই, ওর মা মরে গিয়েছে।'

'মরে গিয়েছে !' হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না ইন্দিরা।

'ওর বাবা তাই বুঝিয়েছেন ওকে। প্রথম যখন ওর মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়—'

'আমার কাছ থেকে যখন ওর বাবা ওকে চুরি করে নিয়ে যায়—' ইন্দিরা ক্রুদ্ধ হস্তক্ষেপ না করে পারল না।

'তা জানি না। আমাকে যা বলা হয়েছে তাই বলছি। প্রথম যখন বিজুর মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়, বিজুকে বলা হয় ওর মা হাস-পাতালে আছে। তারপর সে বিচ্ছেদ যখন দীর্ঘতর হয় আর বিজুর প্রশ্ন যখন ব্যাকুলতর হতে থাকে তখন তাকে বোঝানো হয় তার মা মরে গেছে, আকাশের তারা হয়ে গেছে—'

'একবার বিজুকে নিয়ে আসুন না, দেখি না ভুতুড়ে মা দেখে কেমন তার রিয়্যাকশান হয়।' যেন এটা একটা ছেলেখেলা এমনি ভাবের থেকে বললে সুগতা।

'তারপর মা যখন ছেলেকে ছেড়ে চলে যাবেন, ছেলে এখানে একলা পড়ে থাকবে—তখন ?'

মা না বুঝুক, মুহূর্তে সমস্ত ছবিটা অনীশ আর সুগতার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'তা ছাড়া উনি যে এতটা পথ এসেছেন সেটা, মাপ করবেন,' জ্ঞানেশ হাত জোড় করবার ভঙ্গি করল। 'স্নেহে তত নয়, যত জেদের বশবর্তী হয়ে।'

'আপনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, আপনার কিছু বুঝতে আর বাকি নেই।' রাগের কথাটা হালকা হাসির টান দিয়ে বললে ইন্দিরা।

'কী আর করব বলুন, আপনার স্বামীই সব বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

'কী বুঝিয়ে দিয়েছেন ?' এবার সুগতা ঝাপটা মারল।

'বিশেষ কিছু নয়। কলকাতার কোর্টে ওঁর স্বামী সুদক্ষিণ সরকার বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করেছেন।'

'তাতে কী!' ইন্দিরা মুখিয়ে উঠল।

'তাতে ছেলের কাস্টডি নিয়ে প্রশ্ন। কে কাকে ফাঁকি দিয়ে ছেলেটাকে ছোঁ মেরে নিজের কবজায় নিয়ে যেতে পারে সেই চেষ্টা।' জ্ঞানেশ নৈর্ব্যক্তিক হল। 'নইলে, ছেলেটা নতুন পরিবেশে মন মজিয়ে

একরকম আছে, তাকে হঠাৎ সেন্টিমেণ্ট্যালি আপসেট্ করে দেয়াটা কাজের কথা নয়। ছেলের মঙ্গলচিন্তাই যার প্রধান চিন্তা—'

'মায়ের চেয়ে আপনার যে দেখছি বেশি দরদ—' ঝঙ্কার দিল সুগতা।

জ্ঞানেশ হাসল। বললে, 'যাক গে, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। বিজুকে পেয়েছি আমরা তার বাপের কাছ থেকে। তাই তার বাপের কথাই এক্ষেত্রে চলবে, বলবৎ হবে। মা ছেলেকে দেখে এ বাপের স্পষ্ট নিষেধ। সে নিষেধ অমান্য করা যাবে না।'

'কেন, নিষেধ কেন?' এও সুগতার জিজ্ঞাসা।

'তা জানি না। তবে ডিভোর্স মামলার পিটিশনের একটা নকল আমাকে মিস্টার সরকার দিয়েছেন, তাতে সব ভাইলেস্ট য়্যালিগেশান আছে—'

'সব—সব মিথ্যে।' ইন্দিরা আগুন হয়ে উঠল।

'হয়তো আপনার কথাই ঠিক। সব মিথ্যে। কিন্তু আমি নাচার, আমাকে গার্ডিয়ানের কথা, মিস্টার সরকারের কথাই মানতে হবে।'

সুগতা ইন্দিরাকে নিয়ে এল বাইরে। গাড়িতে দুজনে এসে নিঃশব্দে বসল, বসে রইল নিঃশব্দে। কতক্ষণ পরে সামিল হল অনীশ।

বাড়ি এসেই নিভৃতি খুঁজে নিয়ে সুগতা স্বামীকে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী, কী ভাইলেস্ট য়্যালিগেশন!'

'মেয়ে তো, তাই মেয়ের সম্পর্কে কু-কথা শোনবার জন্যে খুব আগ্রহ?' অনীশ টিপ্পনী কাটল।

'তোমার আগ্রহও তো কম নয়।' পালটা ছুঁড়ল সুগতা। 'তাই নিন্দাটা শোনবার জন্যে রেক্টরের সঙ্গে কেমন একটু একলা হলে!'

'সে তো তোমারই কৃপায়। মিসেস সরকারকে তখন চালাকি করে টেনে নিয়ে গেলে বলেই তো রেক্টরের সঙ্গে একলা হতে পারলাম।'

'অতএব', খিলখিল করে হাসল সুগতা, 'কার নিন্দা করো তুমি? এ আমার এ তোমার পাপ। আমরা এক নৌকোর সোয়ারি। সুতরাং বলো এবার কথাগুলো কী।'

'স্বামী-স্ত্রীর যতক্ষণ ভাব ততক্ষণ তারা এক দেহ এক মন, আর যখন তারা শত্রু তখন তারা সাপ-বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর। তখন হেন কুকথা নেই যে তারা কইতে পারে না, হেন কুকাজ নেই তারা করতে পারে না। অন্য শত্রুতায় তবু সীমা আছে কিন্তু দাম্পত্য শত্রুতায় কোথাও কেউ রেখা টানতে পারেনি।'

'কিন্তু আহা, কুকথাগুলো কী?' অস্থির হয়ে উঠল সুগতা।

'প্রথম, কোন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত—'

'দ্বিতীয়?'

'দ্বিতীয়, রোগ আছে সাংঘাতিক। যার জন্যে ছেলেকে ছুঁতে দিতে ধরতে দিতে কাছে রাখতে দিতে আপত্তি।'

'সব বানানো।'

'সমস্ত মামলার সাজসজ্জা। কিন্তু যতক্ষণ সাক্ষ্য-প্রমাণে না ঢুকেছ ততক্ষণ, এমন আইন বানানো, বলবার কারু এক্তিয়ার নেই। কিন্তু তোমার বন্ধু কোথায়?' ব্যস্ত হয়ে উঠল অনীশ। 'তাকে ফিরতি ট্রেন ধরতে স্টেশনে পৌঁছিয়ে দিতে হবে তো?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি একা যাবে না, আমিও সঙ্গী হব।' কালো কটাক্ষ হানল সুগতা।

'এখনো আমরা এক, একা নই। একমন হলে সমুদ্র শুকোয় কিন্তু একা নদী বিশ ক্রোশ।'

স্বচ্ছ মুখে হাসতে লাগল সুগতা।

কলকাতায় পৌঁছেই উকিলের উপর চড়াও হল ইন্দিরা।

শিগগিরই, সম্ভব হলে আজই, একটা গার্ডিয়ানশিপের দরখাস্ত করুন আমার হয়ে।

'কেন, কী হল!' উকিল মদনগোপাল মজা পেল। বললে, 'য়্যালিগেশানস কী?'

'ভাইলেস্ট পসিবল য়্যালিগেশনস।'

'বুঝেছি। আপনার স্বামী মানে ছেলের বাপ অভিভাবক হতে

অনুপযুক্ত—এটা স্টেট করতে হবে। তার জন্যে স্টক বিশেষণ এগুলো—মাতাল, বেশ্যাসক্ত, নির্দয়, বদরাগী, সংসারব্যাপারে উদাসীন—একেবারে অপদার্থ।'

'হ্যাঁ, আর রোগের কথা উল্লেখ করবেন। সরলে সারল্য কিন্তু শঠে শাঠ্য—'

'হ্যাঁ, করব। দু দুটো রোগ বলব। টি-বি আর ভি-ডি—কিন্তু ব্যাপারটা হঠাৎ কী হল বলুন তো।'

ইস্কুলের ব্যাপারটা বললে সব ইন্দিরা। কী অপমান, কী লজ্জা, আঁচলে কোমর জড়িয়ে লড়াই করতে গিয়ে সেই আঁচল খুলে তাতে চোখের জল মুছে আসা। কী ঘেন্না!

'একটা কিছু প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।'

'শুনুন এক কাজ করি।' মদনগোপাল বললে, 'আপনার গার্ডিয়ানশিপের দরখাস্তে ঐ রেক্টর জ্ঞানেশ রায়কে পক্ষ করে দিই। ওর বিরুদ্ধে এই য়্যালিগেশান করি যে ও অবৈধভাবে আমার ছেলেকে আটকে রেখেছে। তাই মামলার যে অর্ডার হবে তা রেক্টরের উপর বাইণ্ডিং হবে—'

'কিন্তু ইতিমধ্যে মামলার নিষ্পত্তির আগেই আমি একবার বিজুকে দেখে আসতে চাই। দেখে আসতে চাই ঐ রেক্টরের সামনেই, ওর কর্তৃত্বের উপর লাঠি চালিয়ে—'

'হ্যাঁ, সঙ্গে একটা ইনটেরিম দরখাস্ত করে দেব, আমি আমার ছেলেকে দেখে আসতে চাই কেমন সে আছে, হস্টেলে কেমন তার যত্ন নেওয়া হচ্ছে। সেন্টিমেন্ট্যালি আপসেট যাতে না হয়, যাতে ওকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়ে-থুয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আসতে পারি তার জন্যে দীর্ঘ সময়ের সাক্ষাৎকার চাই। আমি মা, আমার ভদ্রমহিলার ইণ্টারভিয়ু নয়। আমি আমার শিশুকে ছোঁব, ধরব, কোলে নেব, চুমু খাব—'

'করুন, করে দিন দরখাস্ত। আকুল হয়ে উঠল ইন্দিরা।

একই জজের কাছে দুই মামলা। এক, সুদক্ষিণের পিটিশন, বিবাহ-

বিচ্ছেদের ; দুই, ইন্দিরার পিটিশান, গার্ডিয়ানশিপের। সুদক্ষিণ বিবাহবিচ্ছেদ চাইছে যে হেতু ইন্দিরা ব্যভিচারে লিপ্ত, আর ইন্দিরা ছেলের অভিভাবক হতে চাইছে যেহেতু সুদক্ষিণ দুশ্চরিত্র, অকর্মণ্য। বিবাহবিচ্ছেদের মামলা ইন্দিরা লড়ছে এই বলে যে সুদক্ষিণের সমস্ত উক্তি মিথ্যে, পরোক্ষে আত্মদোষের আচ্ছাদন, আর গার্ডিয়ানশিপের মামলা সুদক্ষিণ লড়ছে এই বলে যে পিতারূপে সেই স্বাভাবিক অভিভাবক, ইন্দিরার সমস্ত অভিযোগ কাল্পনিক।

কিন্তু এখন ঝগড়া তুমুল হয়ে উঠেছে ইনটেরিম বা মধ্যবর্তী পিটিশন নিয়ে যাতে ছেলের সঙ্গে সাময়িক সাক্ষাৎকার চেয়েছে ইন্দিরা।

কোর্ট-রুমের এক দিকে দাঁড়িয়ে ইন্দিরা, কাঁদতে কাঁদতে দুই চোখ লাল ; আরেক দিকে দাঁড়িয়ে সুদক্ষিণ, সর্বক্ষণ রাগ পুষতে-পুষতে সমস্ত মুখ স্থূল, বিবর্ণ।

সমস্ত ঘর লোকারণ্য।

'মা হয়ে ছেলেকে একটিবার চোখের দেখাও দেখতে দেবে না ?' প্রশ্ন করলেন জজ।

'কেন দেব না ?' সুদক্ষিণের পক্ষে উকিল অটলবিহারী উঠে দাঁড়াল। নিশ্চয়ই দেব, যদি সেই দেখাটা ছেলের পক্ষে মঙ্গল হয়।'

'আর সেটা মঙ্গল হবে কিনা তার বিচার করবার অধিকার মার নেই!' পাল্টা টিপ্পনী কাটল মদনমোহন।

'কী করে থাকবে! মার মতলব তো ছেলেটাকে শুধু আপসেট করে দিয়ে আসা, যাতে করে ছেলেটা অসুস্থ হয়ে পড়ে, যাতে করে মার ছেলের কাছে থাকবার কেসটা আরও স্ট্রং হয়। নইলে স্থানে-স্থিতিতে ভালো ইস্কুলে যোগ্য লোকের তত্ত্বাবধানে ছেলেটা আছে, তাকে ডিস্টার্ব করার হেতু কী ?'

অটলবিহারী অটল তার যুক্তিতে।

'আপসেট বা বিপর্যস্ত করার একটা কথা উঠেছে।' শুনুন স্যার,' মদনগোপাল টাইয়ের নটটা একবার ধরল বাঁ হাতে। 'ওরা ছেলের কাছে

প্রচার করেছে যে ওর মা মরে গেছে। বুঝুন এটা আপসেট করা নয়? একটা মিথ্যা কথা বলে ছেলেটাকে চিরজীবন ম্লান করে রাখা শোকাচ্ছন্ন করে রাখা—'

'এমন যে মা সে মৃত নয় তো কী।' অটলবিহারী ফোঁস করে উঠল।

'ছেলের কাছে এমন-মা তেমন-মা কী। ছেলের মা, মা।' মদন-গোপাল টাইয়ের গ্রন্থিটাকে আরো একটু আঁট করল। 'এখন ছেলেকে সত্য বোঝাবার জন্যে তাকে প্রকৃতিস্থ করার জন্যেও অন্তত মাকে একবার দেখা করতে দেওয়া দরকার—'

'কখনোই নয়', অটলবিহারী টলল না। 'এখন মাকে পাওয়া মানেই ছেলের ভীষণ আনন্দিত হওয়া—সেই আনন্দেরও একটা আপসেটিং এফেক্ট হবে নির্ঘাৎ—'

'চমৎকার।' মদনগোপাল বিদ্রূপ মেশাল। 'এমনি যেখানে বাপে-মায়ে বিরোধ নেই, সেখানে স্বাভাবিক ক্ষেত্রে, মা যদি ছেলেকে দেখতে যায় হস্টেলে, ছেলেকে মা আনন্দিতই করে, এবং বিদায়ের সময়ে বিষণ্ণ—তাতেও ছেলে আপসেট হয়ে যায়। কিন্তু সেই কারণে মায়ের দেখা করাটা নিষিদ্ধ হয়?'

'এখানে যে মশাই ভূত হয়ে দেখা করতে যাওয়া। ভূত দেখলে ভয় পাবে না ছেলে? ছেলেকে ভূত হয়ে ভয় পাইয়ে দেয়া ঠিক হবে?'

'নিশ্চয় ঠিক হবে। ওখানে মায়ের ভূত হয়ে যাওয়া নয়, বাপকেই ভূত বলে দেখতে শেখা। যে মিথ্যে বলতে পারে, আর এমন মিথ্যে যে জ্যান্ত লোক মড়া হয়ে যায়, সেই তো আসল ভূত। সুতরাং সত্যের খাতিরে ন্যায়ের খাতিরে—'

'আমরা এখানে ধর্মকথা শুনতে আসিনি। সমস্ত প্রশ্নটাই হচ্ছে ছেলেটার মঙ্গলের প্রশ্ন—'

উকিলের তর্কের কি শেষ হয়? তারা তো নিরস্ত হবার জন্যে জন্মায়নি। তাদের তো রিটায়ারমেন্টও নেই।

তাই জজ বললেন, 'সমস্ত ব্যাপারটার একটা মীমাংসা হয় না?'

'হ্যাঁ, হয়। কেন হবে না? চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী।' দু পক্ষের উকিলই ঘাড় হেলাল।

'সমস্ত বিবাহিত জীবনটাই তো একটা আপোসে মিটমাট।' হাসলেন জজ।

'যা মনে হয় সিন্ধু আসলে দেখা যায় বিন্দুমাত্র।'

'আসলে কিচ্ছু নয়, ছোট্ট একটা স্ফুলিঙ্গ থেকেই দাবানল।'

'পক্ষরা আর তাঁদের উকিলেরা চলুন আমার খাসকামরায়।' জজ উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। 'দেখা যাক, নিভৃতে আলোচনা করে একটা রফা-নিষ্পত্তিতে আসা যায় কিনা।'

ভালো কথা। চিহ্নিত কজন লোককে নিয়ে জজ তাঁর কামরাতে ঢুকলেন। তাঁর দু'পাশে বসালেন দুজনকে, ডাইনে ইন্দিরা, বাঁয়ে সুদক্ষিণ। বিরুদ্ধ উকিলেরা যার যার মক্কেল ঘেঁষে।

ইন্দিরা আর সুদক্ষিণকে এবার লক্ষ্য করলেন জজ। বললেন, 'পরস্পরের দিকে তাকান। একটু হাসুন। মনে করুন আমরা এখানে কেউ নেই। আমরা প্রপঞ্চ।'

দুজনেই হাসল, কিন্তু কেউ কারু মুখের দিকে তাকাল না।

'যদি বলেন তো আপনাদের দুজনকে নিরিবিলি এ ঘর ছেড়ে দিয়ে আমরা চলে যাই।' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন জজসাহেব। সঙ্গে-সঙ্গে উকিলের দল।

সে কী! ইন্দিরা আর সুদক্ষিণও উঠে পড়েছে।

মানে এরা নিরিবিলি হতে রাজি নয়।

আবার যে যার চেয়ারে বসল স্থির হয়ে।

জজসাহেব বললেন, 'বেশ তো, বলুন না কোথায় আপনাদের বাধছে। কথা ক'ন না। কথা কয়ে কাটিয়ে দিন সব ভুল বোঝাবুঝির কুয়াশা। এমন কী আছে, কী হতে পারে, যা ক্ষমা দিয়ে বা অনুতাপের অশ্রু দিয়ে ধুয়ে-মুছে নেওয়া যায় না?' শত ক্ষতবিক্ষত হয়ে লোক

ফিরে আসতে পারে স্বাস্থ্যে, তেমনি শত কলঙ্কিত অবস্থায়ও লোক ফিরে আসতে পারে ভালোবাসায়, সমর্পণে। কিছুই কঠিন নয়, অসম্ভব নয়। সন্নিবেশটা একটু নড়ে গিয়েছে মাত্র, কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে চেষ্টা করলে যে তিনটি অক্ষরে ডি-ও-জি ডগ হয়ে আছে তাই দিয়েই জি-ও-ডি গড করে তোলা যায়। বেশ তো, ক'ন না কথা।' সুদক্ষিণকে স্পষ্ট লক্ষ্য করলেন জজ।

'ঐ ভ্রষ্টার সঙ্গে কী কথা কইব?' হুমকে উঠল সুদক্ষিণ।

'দেখুন কী বর্বরের মত ভাষা।' জ্বলে উঠল ইন্দিরা। 'কোর্টে বসেও জিভের উপর যার শাসন নেই, বুঝুন সে কত বড় পাষণ্ড।'

এই নিয়ে দুজনে শুরু হয়ে গেল বচসা। বকাবকি গালাগালি ঝমাঝম ঝগড়া। যা মুখে আসে তাই বলতে লাগল। যা মুখে আসে না তাও।

জজ ও উকিল সবাই অপ্রস্তুত। কিছুতেই থামানো যায় না কাউকে। এ যে দেখি বিপরীত কাণ্ড। কেঁচো খুঁড়তে সাপের আবির্ভাব।

এবার শুরু হয়েছে চরিত্র ও সতীত্বের পাঁচালি।

জজ ভাবছেন, সব কথার শেষ হয়, এ-কথারও শেষ হবে। আর শেষ হয়ে গেলে যে স্তব্ধতা জাগবে তাতে যদি শেষ কথাটি উচ্চারিত হয়।

কিন্তু, না, এবার এসেছে এরা সন্তানের পরিচ্ছেদে।

'মা, না, ডাইনি। কালনাগিনী।' বললে সুদক্ষিণ।

'বাবা না বাজেলোক। ফালতু।' বললে ইন্দিরা।

যদি পারে তো সুদক্ষিণ টেবিল থেকে পেপার ওয়েটটা কুড়িয়ে নিয়ে ইন্দিরার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারে। আর, ইন্দিরা যদি পারত, নখে-দাঁতে ছিঁড়েকুটে সুদক্ষিণের মুখটা রক্তাক্ত করে দিত।

এমনি তীক্ষ্ণতম উত্তেজনার মুহূর্তে ইন্দিরা চেঁচিয়ে উঠল, 'কে বলে বিজু তোমার ছেলে?'

'কে বলে তোমার?'

অদ্ভুত করে হাসল ইন্দিরা। বললে, 'মাদারহুডটা ফ্যাক্ট। ফাদার-

হুডটা প্রিজাম্পশান। আর প্রিজাম্পশানটা সব সময়েই রিবাটেবল। তাই প্রিজাম্পশানটা—অনুমানটা খণ্ডে দিচ্ছি। কিসের তুমি স্পর্ধা করছ, তুমি বিজুর বাপ নও।'

'তা হলে কে, কে সে কীর্তিমান?' দু'হাতে চেয়ারের দুই হাতল ধরে মুখিয়ে এল সুদক্ষিণ।

'সে প্রশ্ন অবান্তর। তোমার যেটুকু জানবার দরকার সেটুকু জেনে রাখ।'

'স্যার,' জজকে সম্বোধন করল সুদক্ষিণ। 'ওর এই য্যাডমিশনটা রেকর্ড করে রাখুন। ওর ব্যভিচারের এ একটা সুদৃঢ় প্রমাণ।'

জজ বললেন, 'ওকে ওথ দেওয়া হয়নি, তাই ওর এই স্টেটমেণ্ট এভিডেন্স নয়।'

মিটমাটের আশা বৃথা। জজ সবাইকে নিয়ে আবার কোর্টে চলে এলেন।

কোর্টে এসে অর্ডার দিলেন। দরখাস্তকারী মানে ইন্দিরার ইনটেরিম পিটিশন মঞ্জুর হল। সে দরখাস্তলিখিত স্থানে কথিত ইস্কুলের হস্টেলে তার ছেলে বিজনকুমার সরকারের সঙ্গে যে কোনো দিন বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে দেখা করতে পারবে। দেখার কাল এক ঘণ্টা। ইন্দিরা ইচ্ছে করলে তার ছেলেকে যা ইচ্ছে উপহার দিতে পারবে। ছেলেকে ছুঁতে, ধরতে, আদর করতে পারবে। কথিত স্কুল ও হস্টেলের রেক্টর তাকে এসব ব্যাপারে কোনো বাধা দিতে পারবে না। বরং রেক্টরকে এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে উল্লিখিতভাবে দরখাস্তকারীর সাক্ষাৎকার সুগম ও সহজ হয় তা সে দেখবে সযত্নে।

অর্ডারের আর্জেণ্ট নকল বের করে ইন্দিরা বাড়ি গেল।

তার উকিলরা বললে, 'আজ রাতের ট্রেনে চলে যান। দেরি করলে সুদক্ষিণ না ও-স্কুল থেকে ছেলেকে সরিয়ে ফেলে।'

ইন্দিরা বললে, 'রেক্টর খুব জব্দ। তাই না?'

'নিশ্চয়।' আশ্বাস দিল মদনগোপাল। 'ইণ্টারভিউতে এবার বাধা

দিলে কন্‌টেম্পটে পড়বে। অর্ডারের নকলটা তাকে দেখালেই সে দেখা করিয়ে দিতে বাধ্য। সে এই মোকদ্দমার পার্টি। সে সব অর্ডার জানে এই আইনের অনুমান।'

ছেলের সঙ্গে দেখা হবে, তার চেয়েও বেশি আনন্দ, রেক্টরের সঙ্গে দেখা হবে বলে। সেই কঠিনকে এখন কেমন বিগলিত দেখাবে এই ভাবতেই সুখ।

অটলবিহারী সুদক্ষিণকে পরামর্শ দিল, আজ রাতের ট্রেনেই বেরিয়ে পড়ুন। অর্ডারটা রেক্টরের উপর জারি হবার আগেই ছেলেকে ঐ ইস্কুল থেকে হস্টেল থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। ছেলেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার পর অর্ডার মিনিংলেস। ছেলেকে ইস্কুল থেকে সরানো যাবেনা এখন কোনো ইনজাঙ্কশানের অর্ডার হয়নি। সুতরাং মেক হেস্ট। সমস্তটাই প্রেস্টিজ-ফাইট। বেরিয়ে পড়ুন। ছেলেকে নিয়ে সটকান দিন।

দেখাচ্ছি কার ছেলে। সুদক্ষিণ কোমর বাঁধল।

একই ট্রেনে দুজনে চলল, কিন্তু কেউ কিছু জানল না।

সুদক্ষিণ ভাবছে কেমন আলগোছে সরাবে ছেলেকে আর ইন্দিরা ভাবছে কেমন নিবিড় করে ধরবে বুকের মধ্যে।

শেষ মুহূর্তে একটা ফার্স্ট আপার বার্থ পেয়ে গেল। সেকেণ্ড ক্লাস টিকিটটা বদলে নিল সুদক্ষিণ। কয়েকটা কামরা পরেই সেকেণ্ড ক্লাস লেডিজে চলেছে ইন্দিরা।

কেউ কারু খবর রাখে না।

রাত গেল। পরদিন সকাল গেল। দুপুরও যায় যায়।

মাঝরাত থেকেই বৃষ্টি সুরু হয়েছে। এ অঞ্চলে কয়েকদিন থেকেই হচ্ছে একনাগাড়ে।

ট্রেন আর যাবে না। সামনের একটা ব্রিজ ভেঙে গিয়েছে বন্যায়। আরো এক রাত্রি ও এক সকালের রাস্তা ছিল।

এখন উপায়? কাকে কী জিজ্ঞেস করে? কে পরামর্শ দেয়?

ভাঙার যেমন রিপোর্ট, কেউ বলছে এক দিনেই সেরে ফেলবে। কেউ

যা বলছে এক সপ্তাহ। যদি সময় থাকে একদিন এখানে বা পিছনের কোলা স্টেশনে অপেক্ষা করতে পারো। অপেক্ষা না পোষায় ফিরে যাও স্বস্থানে। এ ট্রেনটাই ডাউন ট্রেন হয়ে ফিরে যাবে।

স্টেশনটা কী দেখতে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল ইন্দিরা।

দেখল, বৃষ্টিটা ধরা, তার কামরার কাছেই সুদক্ষিণ দাঁড়িয়ে। আর খানিকদূর থেকে হাসিমুখে এক শার্ট-শর্টস পরা যুবক এগিয়ে আসছে দ্রুত পায়ে।

অনায়াসেই তাকে চিনতে পারল ইন্দিরা। তার বড় ননদের ছেলে নন্দন।

শুনেছিল এরকমই কোনো একটা স্টেশনে সে পোস্টেড। রেলের সে ইঞ্জিনিয়র জাতীয় কিছু একটা কাজ করে। রাস্তাঘাটের মেরামতি দেখেশুনে বেড়ায়।

'কি আশ্চর্য, আপনারা কোত্থেকে?' নন্দন নিচু হয়ে সুদক্ষিণকে প্রণাম করল।

সুদক্ষিণ ভেবেছিল 'আপনারা' বুঝি জিভের ফস্কে যাওয়া। কিন্তু, না, পিছনে কাউকে লক্ষ্য করছে নন্দন। বলছে, 'নেমে পড়ুন। ট্রেন আর যাবে না।'

সুদক্ষিণ চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখল, ইন্দিরা।

ইন্দিরা এমন মুখ করে নামল আকাশে এ দুর্যোগ ছাড়া আর যেন কোনো দুর্যোগের খবর সে রাখে না।

'আপনারা যাচ্ছিলেন কোথায়?'

'আমাদের ছেলেকে দেখতে।' দিব্যি বললে ইন্দিরা।

সুদক্ষিণের কাছে আরো একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা আশা করে নন্দন। সুদক্ষিণ জায়গা ও স্কুলের নাম দিলে। বললে, 'ছেলেকে ঐ স্কুলের বোর্ডিঙে রেখেছি। দুজনে যাচ্ছিলাম একটু দেখতে।'

যেহেতু নন্দন, মামা আর মামিমাকে একসঙ্গে ভাবছে, একদলে, তখন অলক্ষ্যে নিজেদেরও অজানতে, সুদক্ষিণ আর ইন্দিরা কাছাকাছি সরে

এসেছে, বা তাদের সরে আসতে হয়েছে কাছাকাছি। যাতে নন্দন কিছু না জানে না বোঝে এ যেন দুজনেরই মনোগত অভিলাষ।

'ব্রিজ বোধ হয় এক দিনেই রিপেয়ার হয়ে যাবে। কাল সকালে খবর পাব। যদি রিপেয়ার হয়ে যায় কালই ফের স্টার্ট করতে পারবেন। নচেৎ,' পরিচ্ছন্ন দাঁতে হাসল নন্দন, 'দেরি দেখলে ফিরে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। এখন চলুন তো আমার কোয়ার্টার্সে। ব্যাচেলারস কোয়ার্টার্স।'

ওদের দুজনকে নন্দন পৃথক বা ভিন্ন দলের ভাবতে পারছে না, অমনি ভাবারও কোনো কথা ওঠে না, সুতরাং ইন্দিরা আর সুদক্ষিণকে পাশাপাশিই বসতে হল ট্যাক্সিতে।

কে জানত গায়ের সঙ্গে গা লাগবে, নিশ্বাসের সঙ্গে নিশ্বাস। কে জানত এতক্ষণ এত কাছাকাছি বসেও দুজনে খেয়োখেয়ি করবে না।

বেশ খানিকটা নির্জনে ড্রাইভ করে এসে পাওয়া গেল প্রকাণ্ড একটা পাহাড়, তারই কোলে সার-সার কতগুলি শাদা বাড়ি, ওই ইঞ্জিনিয়ার্স কোয়ার্টার্স। কী সুন্দর, কেমন ছবির মত দেখতে। আমরা ওখানে থাকতে পারি না?

'ওরকম নির্জনে প্রকৃতিকে প্রতিবেশী করে থাকতে পারলে জীবনের অন্য অর্থও বুঝি আবিষ্কার হয়।' বলতে বেশ ভালো শোনাবে বলে বললে সুদক্ষিণ।

'আমি তো একলা। তাই আমার শুধু দুই কামরা। বেড আর সিটিং। আর এক চিলতে বারান্দা। সবই অত্যন্ত শীর্ণ। আপনাদের খুব কষ্ট হবে।' নন্দন কুণ্ঠিতের মত মুখ করল।

'না, না, কষ্ট কী।' কত কষ্ট যেন এমনি উপেক্ষা করেছে, সেই ভাবে বললে সুদক্ষিণ।

আর কত রাত এমনি কাটিয়েছে এমনি ভাবের থেকে ইন্দিরা বললে, 'মোটে একটা তো রাত!'

বাড়িতে পৌছেই চায়ের পাট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল নন্দন।

'খবরদার, কম কথা বোলো এখানে।' ফাঁকায় পেয়ে বলে বসল ইন্দিরা।

'চারদিকের এই পার্বত্য গাম্ভীর্য কথা কইতেই দিচ্ছে না।' বললে সুদক্ষিণ।

'খুব ভালো। কথা কইতে শুরু করলেই না ঝগড়া শুরু হয়।'

'হ্যাঁ, আমি সাবধানে আছি।'

'সব বিষয়েই সাবধান থেকো।' কালো কটাক্ষ ইন্দিরার চোখের কোণে ঝিলকিয়ে উঠল।

চায়ের পাটের পরে রাতের খাওয়ার পাট।

আর তখনই নামল বৃষ্টি। আবার বৃষ্টি। পাহাড় গলানো বৃষ্টি।

নিজে সিটিং রুমটা নিয়ে বেড রুমটা ওদের দিয়েছে নন্দন। একটা বাড়তি খাট আনবে ভেবেছিল, বৃষ্টির জন্যে হল না।

'খুব কষ্ট হবে আপনাদের।'

সব দেখেশুনে সুদক্ষিণ বললে, 'না, না. কষ্ট কী।'

'মোটে এক রাতের তো মামলা।'

খেয়ে-দেয়ে খাটে শুয়েছে ইন্দিরা, আর সুদক্ষিণ চেয়ারে বসে ঢুলছে।

আর বৃষ্টি ঝরছে অবিচ্ছেদ।

কতক্ষণ পরে ইন্দিরা উঠে এল। বললে, 'তুমি এবার শোও, আমি চেয়ারে বসি।'

তাই। সমান-সমান।

সুদক্ষিণ শুল। আর চেয়ারে বসে ঢুলতে লাগল ইন্দিরা।

বৃষ্টি ঝরছে অতন্দ্র।

কতক্ষণ পরে উঠে এল সুদক্ষিণ। বললে, 'এর কোনো মানে হয় না।'

'কিংবা ভীষণ কোনো মানে হয়।' দীপ্ত চোখে তাকাল ইন্দিরা।

'আজ রাত্রে তো আমরা সুজন। সুজন হলে তেঁতুল পাতায়ও ন'জন ধরে শুনেছি।'

'কী সর্বনাশ! মোটেই ন'জন নয়, দু'জন। সুজনের সঙ্গে দু'জন মেলে।'

'কুজনও মিলত, তবে তার দরকার নেই।'

'কথার অতীত এক কথা আছে, তাই হয়তো আজ পাহাড়ে, মাঠে, অন্ধকারে, বৃষ্টিতে—'অনেকদিন পর কথা বলতে পারল ইন্দিরা।

'তাই অনায়াসেই খাটে কুলোবে দুজনকে।'

'এবং কে জানে হৃদয়েও।'

ভোর হয়-হয় এমন সময় জাগা চোখে জিজ্ঞেস করল সুদক্ষিণ, 'যদি ব্রিজ রিপেয়ার হয়েছে খবর আসে, তা হলে ছেলেকে কি দেখতে যাবে?'

'কী দরকার।' বোজা চোখে বললে ইন্দিরা, 'বাড়ি ফিরে যাব।'

'আপনার গাড়ি আছে ?

'তা আছে একখানা।'

'কখানা আছে জানতে চাইনি। জিগগেস করছি, সঙ্গে আছে ?'

'আছে।'

'তাতেও হবে না।' বিজ্ঞের মত মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল লীনা। 'জায়গা আছে ?'

'তা হয়ে যাবে একরকম—' ভীতু-ভীতু চোখে চারদিকে তাকাতে লাগল দিবাকর।

তা হলে সঙ্গে পরিবার আছে ? অন্য বন্ধুবান্ধব ? বন্ধুবান্ধব নিয়ে কেউ আসে এমন সভাতে, মফস্বলে ? আর পরিবার, পরিবারের লোকজন যদি থাকবে, তা হলে শুরুতেই, শুধু উদ্বোধনের পরেই কেউ পালায় ? আসল যে গানবাজনা, সে তো শেষের দিকে। গানবাজনা পর্যন্তই যদি না থাকবে তা হলে তাদের সভাতে আসা কেন ? তাও এত দূর !

তুমি সভাতে আসনি ? ছোট্ট করে বিবেক জিগেগস করল।

না। বিবেকের মুখে আঁচল চাপা দিল লীনা। আমি বেড়াতে এসেছি। আমার কাজ শোনা নয়, আমার কাজ দেখা।

মণ্ডপের বাইরে বেরিয়ে এল দিবাকর। পিছে-পিছে লীনা।

'এখুনি চললেন স্যার ?' উদ্যোক্তাদের মধ্যে কে একজন অনুনয় করে উঠল : 'আরেকটু থেকে গেলে হত না ?'

'ভীষণ জরুরি কাজ রয়েছে কলকাতায়। কিছুতেই পারলাম না এড়াতে—' দিবাকর লীনার দিকে তাকাল : 'তুমি এসেছিলে কিসে ?'

'বাসএ।'

'বাস তো অনেকক্ষণ থাকবে—'

'হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।' উদ্যোক্তাদের মধ্যে থেকে কে আরেকজন বলে উঠল: 'ফাংশন শেষ হয়ে যাবার পরেও ঘণ্টাখানেক। কলকাতার যাত্রীদের জন্যেই এই ব্যবস্থা—'

'আর তুমি তো কলকাতারই যাত্রী।' লীনার দিকে চেয়ে হাসল দিবাকর।

'সে তো আপনিও।' লীনা চোখে লক্ষ্মীকটাক্ষ হানল।

'আর তুমি কষ্ট করে বাসএ এসেছিলে নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত গান শুনতে।' প্রায় মর্মমূলে চিমটি কাটার মত করে বললে দিবাকর।

'আর আপনিও তো সভাপতি সেজে এসেছিলেন শেষ পর্যন্ত সভার কাজ চালিয়ে যেতে।' পালটা পেরেক ঠুকল লীনা।

'তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বলো?'

'সুতরাং গাড়িতে উঠুন।'

তবু আশেপাশের লোকদের শোনানো দরকার, তাই দূরমনস্কের মত দিবাকর বললে, 'হঠাৎ জরুরি কাজ পড়ে গেল যে।'

শোনানো দরকার লীনারও। তাই সেও বললে অন্যমনস্কের মত: 'কাজ তো আমারো জরুরি।'

কেলেঙ্কারি! প্রায় বলে ফেলেছিল লীনা—যখন গাড়িটা দেখল। গাড়িটার বাইরের চেহারায় নয়, ভিতরকার শূন্যতার চেহারায়।

'সে কি, ড্রাইভার নেই?'

'আমিই ড্রাইভার।' দিবাকর বসল হুইলে।

'নিজে ড্রাইভ করে এতদূর এসেছেন? বলিহারি!'

'বলে আর হারতে হবে না। এখন দয়া করে উঠে পড়ো।' পিছন ফিরে ভিতরের দরজা খুলে দিল দিবাকর।

লীনা ডান পাশ থেকে ঘুরে বাঁ দিকে চলে এল। বললে, 'কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন বুঝি?'

এ আবার কী প্রশ্ন! তবু ত্বরিতদাপ্তিতে দিবাকর বললে, 'শুধু কবিতা নয়, সাহিত্যই ছেড়ে দিয়েছি।'

'তা না হলে এ দু লাইনের সোজা কবিতার মোটা মিলটা দিতে পারেন না?' বাঁ দিকের সামনের দরজা খুলে দিবাকরের বাঁ পাশে বসে পড়ল লীনা। 'আমাকে দিব্যি পিছনে রেখে একা-একা সামনে বসলে কি পদ্য মেলে?'

'আজকালকার পদ্যে মিল থাকে না।' দিবাকর মোটরে স্টার্ট দিল।

'থাকে না বুঝি?' ঘাড় ফিরিয়ে হাসল লীনা। বললে, 'কিন্তু আসলে, আপনার মতলব কী সঙ্ঘাতিক!'

'বা, সে কী কথা! তুমিই তো ইচ্ছে করে পাশে এসে বসলে।'

'সেই কথা বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে, আমাকে পিছনে বসিয়ে যদি দৈবাৎ একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটাতেন তা হলে আমি কী ভয়ানক বিপদে পড়তাম!'

'দৈবাৎ অ্যাকসিডেন্ট ঘটাতাম মানে?' একটা সাইকেল-আরোহীর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল দিবাকর। 'যা দৈব তা আবার মানুষে ঘটায় কী করে?'

'এই যে এত বচ্ছর পর আমাদের দেখা হল, এটা কী?' লীনা আবার লক্ষ্মীকটাক্ষ হানল।

'এটা দৈব।'

'হ্যাঁ, দেখাচ্ছে দৈব। কিন্তু এটা আমি নিজে ঘটিয়েছি।'

'তুমি? নিজে?' লীনার মুখের দিকে ঘাড় ফেরাতে ইচ্ছে করছিল দিবাকরের কিন্তু একটা বাঁশের গাড়ি সামনে এসে পড়তেই তাকে স্থির হতে হল।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। পার্টিশনের পর আপনি পশ্চিমবঙ্গে অপ্‌ট করলেন, আমি সেই মাঠ আর নদীর দেশেই পড়ে রইলাম। স্বপ্নেও ভাবিনি আর আমাদের দেখা হবে। তারপর

পাকেচক্রে আমাকে চলে আসতে হল কলকাতা। আপনার খোঁজ নিয়ে জানলাম আপনি মফস্বলে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একটা চিঠি লিখতে ইচ্ছে হল আপনাকে যে আমি আর দূরে নেই, চলে এসেছি কাছাকাছি। যদি সত্যি উত্তর দিতেন, সটান হাজির হতে পারতাম মফস্বলে। কিন্তু সে সব বড় রূঢ় দেখাত, দৈবের ছায়াটুকুও থাকত না—তাই চুপ করে রইলাম—'

'তারপর?'

'তারপর একদিন শুনলাম কলকাতায় এসেছেন। কিন্তু আপনার বাড়ির ঠিকানাটা কি পাই!'

'বা, সেটা আর কী কঠিন!'

'আর ঠিকানাটা পেলে আপনার ভরা সংসারের ভিড়ের মধ্যেই কি পারতাম দাঁড়াতে? সাহস হত?'

'তবে কী করলে?'

'একটা সভাতে গিয়ে উঠলাম। দেখলাম আপনি সভা উজ্জ্বল করে বসে আছেন সভাপতি হয়ে। গলায় জুঁইফুলের মালা, কপালে চন্দনের ফোঁটা। মঞ্চে আরো অনেকে বসে ছিল কিন্তু আপনার মত কেউই অত সুন্দর নয়। আর সকলে তাদের গলায় মালা তুলে ফেলেছে, আপনিই শুধু রেখেছেন ঝুলিয়ে। মালা তো গলায় দোলবার জন্যেই—'

'কী যেন সেই লাইনটা?' অদৃশ্য সংস্পর্শ লাগল বোধহয়। খড়ের কটা গাড়ি পার করে দিবাকর বললে, 'গলে দোলে তার বিরহব্যথার মালা—'

'আহা, কত আপনার বিরহব্যথা!' লীনা বিদ্রূপ করে উঠল। তির্যক ভঙ্গিতে সরিয়ে নিল কাঁধটা।

'তারপর কী হল সভাতে? দেখা করলে না কেন?'

'সভার শেষে চেষ্টা করলাম এগুতে।' লীনা আবার কাঁধ এনে রাখলে ঠিক জায়গায়। 'কিন্তু কী জঘন্য ভিড়। সবাই আপনাকে ঘিরে ধরেছে, কেউ কেউ বা নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিচ্ছে আর চারদিক

থেকে অর্জুনের বাণের মত ছুটে আসছে অটোগ্রাফের খাতা আর আপনি অম্লান কলমে দস্তখত করে যাচ্ছেন—'

'তুমি কাছে আসতেই পারলে না?'

'কী করে যাই? আমার সঙ্গে কি অটোগ্রাফের খাতা ছিল?'

'কিন্তু একটা হ্যাণ্ডবিল কি কাগজের ঠোঙা, নিদেন একটা ট্র্যামের টিকিট জোগাড় করতে পারলে না? অমনি কিছু একটা এগিয়ে ধরে সই চাইলেই পারতে, আমি তা হলে নিশ্চয়ই বিশেষ চোখে তাকাতাম তোমার দিকে, তুমি হাসতে, আর তোমাকে চিনে ফেলতাম—'

'কেন? আমি কি হ্যাণ্ডবিল, না, কাগজের ঠোঙা? না কি ট্র্যামের টিকিট?' রাগে আবার কাঁধ সরাল লীনা।

'না, ট্র্যামের টিকিট তো ভালো। নট ট্র্যান্সফারেবল।'

'রাখুন।' উড়ন্ত আঁচলটাও রুখতে চাইল লীনা।

'তারপর কোন একটা হালকা সভায় গেলে না কেন? অনেক সভা তো ফাঁকা থাকে, লোকজন একদম হয় না—'

'রক্ষে করুন। আরো দু তিনটে সভায় চেষ্টা করেছিলাম, প্রতিবারই বীভৎস ভিড়। আপনার আসতে পরিকর, যেতে পরিকর। এত লোক নিয়ে চলেন কেন?'

'কি করব বলো। লোক জুটে যায়।' হেডলাইট ফেলে মুখোমুখি একটা বাস আসছে, দিবাকর সুইচ ঘুরিয়ে গাড়ি অন্ধকার করে দিল। বাসটা বেরিয়ে গেলে বললে, 'আজকের সভায়ও তো ভিড় কম ছিল না, কী সাহসে এলে তবে?'

'আজকের যারা উদ্যোক্তা তাদের একজন আমারই সঙ্গে এক ইস্কুলে কাজ করে।' লীনা আবার আঁচলটা ছেড়ে দিল: 'প্রোগ্রামটা কী রকম হবে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিল। কোনো আইটেমই ছাঁটতে দিলাম না, বরং আরো দুটো ঢুকিয়ে দিলাম। বললাম, গাঁয়ের ছাত্রদের প্রবন্ধপাঠের যদি সুযোগ না দেওয়া হয় তা হলে এ সব উৎসবের কোনো অর্থ হয় না। কাজে কাজেই প্রোগ্রামটা খুব দীর্ঘ হল। আর,

মনে কেন জানি না বিশ্বাস ছিল, অতবড় প্রোগ্রাম দেখে আপনি আর সভায় পতি হয়ে থাকতে চাইবেন না, অতিথি হয়েই পালিয়ে যাবেন—'

'অতিথি? ও! প্রধান অতিথি। চীফ গেস্ট। আর সকলে চীপ, একজন শুধু চীফ।'

'কিন্তু আপনি আশাতীত কাজ করলেন। প্রধান অতিথি হলে মাঝামাঝি থাকতেন, আপনি একেবারে উদ্বোধক হয়ে প্রথমেই কেটে পড়লেন।' লীনা সরবে হেসে উঠল: 'আর আমি এসে সামিল হলাম।'

'সমিল হলে বলো।'

'কিন্তু আপনি তো প্রথমে পাঠিয়েছিলেন পিছনে। সে অবস্থায় যদি অ্যাকসিডেন্ট হত কেলেঙ্কারি হত।' ডান হাত তুলে লীনা চুলটা একবার পরীক্ষা করল।

'সে কী কথা? আমি সামনে থাকতাম, আমিই তো ঘায়েল।' হতাম।' হুইল বেঁকিয়ে একটা সাইকেল-রিকশাকে পাশ কাটিয়ে গেল দিবাকর। বললে, 'চোট তোমার পর্যন্ত পৌছুত না, তুমি বেঁচে যেতে।'

'সেই আমার মরে যাওয়া হত। ভাঙা গাড়ি আর জখমী ড্রাইভার নিয়ে কী ভীষণ বিপদে পড়তাম! তখন আপনাকে বাঁচাতাম, না, নিজেকে বাঁচাতাম, চোখে-মুখে পথ পেতাম না—'

'আর এখন?'

'এখন যদি দুর্ঘটনা হয়, দুজনে পাশাপাশি বসেছি, যা হবার একসঙ্গে হবে।' একটা কুকুর মরতে-মরতে বেঁচে গেল। যেন ভয় পেয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে লীনা এল আরো একটু পাশ ঘেঁষে।

হুইলের উপর দক্ষ দৃঢ় হাত, দিবাকর উদাসীনের মত বললে, 'কিন্তু দৈবের কথা তুমি বলতে পারো না।'

'খুব পারি। দৈব তার কাজ করবার জন্যে মানুষের কাছেই আবার সাহায্য চায়। দেখলেন তো, আমি প্রোগ্রামটা দীর্ঘ করলাম বলেই তো দৈবযোগে আপনার সঙ্গে দেখা হল। তেমনি আমি উদ্যোগ করে

সামনের সিটে আপনার পাশে এসে বসলাম বলেই দৈবযোগে এখন একটা সংযুক্ত দুর্ঘটনা ঘটবে।'

'তুমি মাস্টারি করছ কিনা তাই বেশি বুঝছ।' কথাটা নিষ্ঠুরের মত শুনতে, কিন্তু দিবাকরের গলায় অন্যরকম শোনাল।

'না, না, খুব কম বুঝছি আজকাল। শুধু ছাত্রী পড়ালে বুদ্ধি কমে যায়। একজন ছাত্রও যদি পারতাম পড়াতে!'

'পড়াতে মানে বশংবদ করতে।' স্পিড বাড়িয়ে দিল দিবাকর।

'বা, একটু বাধ্য বিনীত না হলে সে পড়বে কী!'

'তার আগে যদি তোমার আঁচলটাকে বশংবদ করো!' চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে দিবাকর লীনার মুখটা একটু দেখে নিল। বললে, 'না কি দুর্ঘটনার জন্যে এটা তোমার দৈবকে সাহায্য?'

'নিন, রাখুন। আঁচলকেই ছাত্র করলুম।' শাসনে-পীড়নে সংবৃত সংকীর্ণ হল আঁচল। একটা ঢাল পেরোতেই কোমল একটা লাফ দিল লীনা। বললে, 'কেন যে নিজে ড্রাইভ করেন ভগবান জানেন।'

'কিছু নিজেও জানি। শ খানেক টাকার মত বাড়তি খরচ করার সঙ্গতি নেই।'

'বাজে কথা।' হুইলের উপর দিবাকরের দুই বন্দী হাতের দিকে লীনা তাকিয়ে রইল। 'কিন্তু আপনার স্ত্রীর যখন দরকার হয়?'

'আমার স্ত্রীর যখন দরকার হয় তখনও আমিই ড্রাইভার।'

'সে কী! সব সময়ে শানানো ক্ষুরের উপর বসে থাকতে শান্তি লাগে? ড্রাইভারের হাতে হুইল ছেড়ে দিয়ে পিছনের সিটে বসে রিল্যাক্স করতে ইচ্ছে করে না?'

'সাধ্য কী রিল্যাক্স করি? সামনেই ঐ ভস্মলোচনের আয়না। ইংরেজিতে যাকে বলে দি ড্রাইভার্স মিরর। চোখ পড়বে আর ভস্ম হয়ে যাব।'

'আপনার চোখ পড়বে কী করে?'

'আমার না পড়ুক ড্রাইভারের পড়বে।' রক্তচক্ষু মুখোমুখি একটা

লরিকে নমস্কার করে বেরিয়ে গেল গাড়ি। আবার স্পিড বাড়াল দিবাকর। বললে, 'সাক্ষী যত কম থাকে ততই ভালো। সেই দুই পাখির গল্প জানো তো? এক পাখি খায়, আরেক পাখি দেখে। ঐ দেখা-সাক্ষী পাখিটাই পাজি। তাই ওটাকে উড়িয়ে দেওয়া, বাদ দিয়ে দেওয়াই সমীচীন।'

বলছে বটে লঘু সুরে, কিন্তু লীনা লক্ষ্য করে দেখল, দিবাকরের হাতে-পায়ে এতটুকু স্খলন নেই শৈথিল্য নেই। তার সমস্ত শরীর যেন সতর্কতায় সমর্পিত। যেন থামবে না, নামবে না, দেরি করবে না এতটুকু। যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যাবে।

লীনা আবার নড়ে-চড়ে বসল।

দিবাকর বললে, 'একটু সরে বোসো। আমার কাঁধের সঙ্গে তোমার কাঁধের ঠোকাঠুকি হবে এটা ঠিক নয়। জানো তো ড্রাইভারের মন যাতে চঞ্চল হয় তা সর্বদা পরিত্যাজ্য।'

সুন্দর সরে বসল লীনা। বললে, 'ফরাসী ঔপন্যাসিক গুস্তাভ ফ্লবেয়ারকে মনে পড়ে?'

'কে, সেই মাদাম বোভারির লেখক? হঠাৎ তার কথা?'

'সেদিন তার জীবনী পড়ছিলাম। ফ্লবেয়ারের যখন পনেরো বছর বয়েস, স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে সমুদ্রপারে এক হোটেলে এসে উঠেছে। সেই হোটেলে আরো উঠেছে শ্লেজিঙ আর তার স্ত্রী এলিসা আর তাদের একটি শিশু। এলিসার বয়স প্রায় সাতাশ, দেখতে রূপসাগর। শ্লেজিঙ-পরিবার স্টিমারে করে সমুদ্রভ্রমণে যাচ্ছে, ফ্লবেয়ারকে সঙ্গে নিলে। ফ্লবেয়ার আর এলিসা বসেছে পাশাপাশি আর সমুদ্রের দুলুনিতে বারেবারে তাদের কাঁধের ছোঁয়াছুঁয়ি হচ্ছে—'

'মানে দুই প্যাসেঞ্জারে, স্টিমারের ড্রাইভার, মানে, সারেঙের সঙ্গে নয়।'

বাধাটা গায়ে মাখল না লীনা। বললে 'সেই স্বল্পস্পর্শের যন্ত্রণাটা প্রেম হয়ে আজীবন ফ্লবেয়ারকে বিদ্ধ করে রইল। স্কুল থেকে কলেজ থেকে

বারেবারেই ফ্লবেয়ার আসত সেই সমুদ্রতীরের হোটেলে, কিন্তু এলিসা কোথায়? এলিসার দেখা নেই। বিদ্যুৎ যেমন যায় তেমনি সে একটি বহ্নিজ্বালা রেখে মিলিয়ে গিয়েছে।'

'সে কি? আর ওদের দেখা হয়নি?'

'হয়েছিল একবার যখন ফ্লবেয়ার যুবক, দেখতে প্রায় গ্রীকদেবতার মত। কণ্ঠে যত কান্না ছিল সব ঢেলে এলিসাকে সে প্রেম নিবেদন করলে। এলিসা প্রতিজ্ঞা করল সে ফ্লবেয়ারের ঘরে যাবে, হ্যাঁ, আজ রাত্রেই। সমস্ত রাত সন্ধ্যা থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফ্লবেয়ার অপেক্ষা করল, কিন্তু এল না এলিসা।'

'কী করে আসবে?' যেন সান্ত্বনার সুরে বললে দিবাকর, 'তার দুই হাত হয়তো এমনি হুইলের উপর ধরা।'

'কিন্তু এমন কি কিছুই নেই যা তার দুই হাতকে নির্জীব করে দিতে পারে, মুহূর্তে তুলে নিতে পারে হুইল থেকে?'

ঘাড় না ফিরিয়েও অন্ধকারে দিবাকর হায়েনার দুই চোখ দেখল।

হঠাৎ লেভেল-ক্রসিংএর বেড়া নেমে এল—আটকে গেল গাড়ি। আর এক তাল অন্ধকারের মত লীনা উছলে পড়ল দিবাকরের দুই শূন্য হাতের মধ্যে। উথলে-উথলে উঠল।

না, হায়েনার চোখ নয়। জালে ধরা পাখীর ভীত-আর্ত নিরীহ চাউনি।

পরাভূতের মত দিবাকর বলে, 'এ দৈবও কি তোমার রচনা নাকি?'

'নিশ্চয়।' লীনা বললে, 'যাতে খুব স্পিড দিয়ে আসেন তারই জন্যে আপনাকে প্রেরণা জুগিয়েছি। আস্তে-আস্তে এলে এতক্ষণে ট্রেন বেরিয়ে গিয়ে লেভেল-ক্রসিং ফাঁকা হয়ে যেত। খুব দ্রুত এসে হঠাৎ বাধা পেলেই দৈবের হাসি শোনা যায়। সমস্ত অহঙ্কারের উদ্দেশে তার নিশ্চিত বিদ্রূপ।'

সমুদ্রের মধ্যে একটা শিলাখণ্ডের মত চুপ করে রইল দিবাকর।

আকুল কণ্ঠে লীনা বললে, 'জানেন, ফ্লবেয়ার কত প্রেম করেছিল

জীবনে, এসেছিল কত নারীর সান্নিধ্যে কিন্তু চরমস্বাদ পায়নি সে কোনোদিন।'

না, ধীরগতি দীর্ঘদেহ মালগাড়ি নয়, একটা রিক্ত এঞ্জিন হু হু শ্বাসে বেরিয়ে গেল।

আর অমনি নিমেষের মধ্যে উঠে গেল লোহার বেড়া। দৈবের অট্টহাসির মতই গাড়িটা মুক্তির আনন্দে ঝকঝক করে উঠল। দিবাকর দুই হাতে আঁকড়ে ধরল হুইল।

এসে গেল কলকাতা।

'আর এই আমাদের হস্টেলে যাবার গলি।' নেমে পড়ল লীনা।

দুদিন পরেই খামে একটা চিঠি এল দিবাকরের কাছে। মেয়েলি হস্তাক্ষর—লীনারই অতৃপ্তির নিমন্ত্রণ হয়তো।

এখন, এ বয়সে, আবার প্রেমপত্র পড়তে হবে নাকি? ভুরু কুঁচকোলো দিবাকর। উড়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে। আবার চিঠি কেন?

প্রেমপত্র নয়, প্রায় মোক্তারের লেখা ফৌজদারি আদালতের দরখাস্ত।

"আপনি শিক্ষিত, গণ্যমান্য, দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে সমাসীন। তাই বলে আপনার সামান্য ভদ্রতা জানা থাকবে না এ ধারণার অতীত ছিল। একজন বিপন্না ভদ্রমহিলা আপনার কাছে সাময়িক আশ্রয়প্রার্থী হলে তাকে সাহায্য দেবার ছলে অপমান করবার আপনার কোনো অধিকার ছিল না। আপনাদের মত গুণী জ্ঞানী মানীদের কাছেও যদি কোনো মহিলা নিজেকে না নিরাপদ মনে করতে পারে তাহলে দেশের অধঃপাতে যেতে আর বাকি কি!"

আরো অনেক-অনেক তিরস্কার। তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠা ওলটাল দিবাকর—শেষ দিকটায় কী আছে? দরখাস্তের শেষ দিকেই প্রার্থনা থাকে, চিঠির শেষ দিকেও নিশ্চয় প্রতিকারের প্রস্তাব আছে। হয় আদালতে যাচ্ছে, নয় থানায়, নয় খেসারতের দাবি মেটাবার হুমকি।

শেষ অনুচ্ছেদে চোখ রাখল দিবাকর। ওসব কিছু নয়। একটা শুধু অভিশাপ দিয়েছে ঃ

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।'

মফস্বলী সভা সেরে আরেক সন্ধ্যায় কলকাতায় ফিরছে দিবাকর, দেখল প্যাণ্ডেলের গেটের বাইরে প্রায় পথের ধারে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে লীনা।

দিবাকরকে দেখে কুণ্ঠিত পায়ে এগিয়ে এল। বললে, 'আপনার গাড়িতে জায়গা হবে?'

'হবে। কিন্তু আজ গাড়ি নয়, আজ ট্যাক্সি।' তার মানে আজ আরও ভয়ের কথা, মনে করিয়ে দিতে চাইল দিবাকর।

'দেখুন কলকাতার ট্রেন আসতে এখনো পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি। অতক্ষণ অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না। আপনার ট্যাক্সিতে একটা লিফ্‌ট দেবেন?'

'স্বচ্ছন্দে।' ট্যাক্সির দরজা খুলে দিল দিবাকর।

নিশ্চিন্ত আলস্যে গা ঢেলে বসল লীনা।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার তার ফুরনের টাকা নিয়ে স্টার্ট দিল।

কেউ কতক্ষণ কথা কইল না।

ভরাট দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল লীনা। বললে, 'একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করেছেন?'

অনেক আশ্চর্য জিনিসই তো আছে চোখের সামনে। সম্প্রতি যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য, গ্রামের লোকেরা কী করে রাস্তা পার হয় দেখ। দিব্যি রাস্তার বাঁ ধার দিয়ে যাচ্ছে, কোনো কারণ নেই, গাড়ির হর্ন শুনলেই ডান দিকে চলে আসবে। তেমনি ডান দিকে থাকলে বাঁয়ে। সেই সূচ্যগ্র মুহূর্তে কেন যে সমস্ত রাস্তাটা পার হওয়া দরকার তা কে বলবে। তার মানে, মানুষ কোনো সময়েই বুঝি নিজের দিকটা নিশ্চিন্ত

দেখে না। হয়তো ভাবে ওপারই আরামরমণীয়। নিজের থেকে পরই বুঝি বেশি সুখী।

'কি আশ্চর্য জিনিস ?' বাইরের দিকে তাকাল দিবাকর।

'আমাদের শাস্ত্র আর কাব্য যখনই ব্রহ্মানন্দকে বর্ণনা করতে গেছে তখনই দেহসুখের প্রতীক নিয়েছে—এ কেন বলতে পারেন ?'

চমকাল না দিবাকর। বললে, 'কিন্তু এ দেহ অপ্রাকৃত।'

'তা হোক। কিন্তু আমরা যারা বুঝব, যাদের বোঝাবার জন্যে এত বাক্যব্যয়, তারা নিরেট মাটির মানুষ। রক্তমাংসের সমাহার।'

'তাই সাধ্য নেই আমরা বুঝি।'

'তাই সাধ্য নেই ওরাও বোঝায়। কিন্তু দেখুন, ব্রহ্মের বেলায়ও সেই ইন্দ্রিয়েরই সম্বন্ধ।' লীনা স্থির করল চোখঃ 'আর, সত্যি করে বলুন, একটা গোটা মানুষকে ভালোবাসতে না পারলে কী করে ভগবানকে ভালোবাসা যায় ?'

'তুমি আজকাল ভগবানকে নিয়ে পড়েছ নাকি ?'

'না, বরং উলটোটা ধরেছি।' লীনা হেসে উঠল।

'সে আবার কী ?'

'রাজনীতি।'

'রাজনীতি ?'

'হ্যাঁ, অনেক নীতিই এ পর্যন্ত ধরেছি, সাজনীতি, লাজনীতি, কাজনীতি—কোন নীতিতেই কিছু কাজ হয়নি। এবার দেখি রাজনীতিতে হয় কিনা—'

'রাজনীতিতে আছে কী ?'

'আর কিছু না থাক, উত্তেজনা আছে।' আবার জমাট দীর্ঘশ্বাস ফেলল লীনা। বললে, 'যে জীবনে উত্তেজনা নেই সে জীবন ভালো লাগে না।'

'তোমার ফ্লবেয়ার কী বলে ?' দিবাকর উসকে দিতে চাইল।

'এবার আর ফ্লবেয়ার নয়। এবার এক মহান কবির জীবনী পড়ছি।'

'কে সে ?'

'গ্যেটে।'

'কী করেছে সে ?'

'সমস্ত জীবন ভালোবেসেছে। ফ্লবেয়ারের মতই যখন তার পনেরো বছর বয়স, ভালোবেসেছে তার চেয়ে বয়সে বড়, গরিব এক সুন্দরীকে, যার নাম দিয়েছে সে গ্রেটখেন। তার পরে আনা কাতারিনাকে, লিলিকে, বাগদত্তা হয়ে গিয়েছে যে মেয়ে সেই শার্লোটকে।'

'তুমি যে ক্যাটালগ মুখস্ত করে রেখেছ ?'

'রেখেছি। কৃষ্ণের শতনামের মত মুখস্ত করে রেখেছি। কিন্তু কী দুঃসাহস বলুন, গ্যেটের যখন মোটে ছাব্বিশ বছর বয়স, ভালোবাসল মিসেস ফনস্টাইনকে, যার বয়স তখন তেত্রিশ আর যে সাতটি সন্তানের মা। আর বুড়ো বয়সে কী করল জানেন না বুঝি ? বুড়ো বয়সে ভালোবাসল যুবতী বন্ধুপত্নী মারিয়ানা ফন ভিলেমারকে।'

'এই সব কথা এত বলছ কেন ?' চঞ্চল হয়ে উঠল দিবাকর।

'এই জন্যেই বলছি, জীবনে সব সময়ে একটি উত্তেজনা কাজ না করলে গ্যেটে অত বড় কবি হতে পারত না। কেউই পারে না হতে। প্রেম মানেই অতৃপ্তি আর অতৃপ্তির যন্ত্রণার মত উত্তেজনা আর কী আছে ?'

'তোমার ভুল।' লীনার একখানা হাত দিবাকর তুলে নিল নিজের হাতে। বললে, 'ও সবই আত্মিক সম্পর্ক।'

'আপনার মুণ্ডু। কিন্তু ফ্রিডেরিকার বেলায় কী করল গ্যেটে ?'

'কী করল ?'

'এক ধর্মযাজকের ষোল বছরের মুক্তকুরঙ্গ মেয়ে এই ফ্রিডেরিকা ধর্মবিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে গ্যেটে এসেছে সেই যাজকের কাছে, তার বাড়িতে অতিথি হয়েছে। এক পলক তাকিয়েই ফ্রিডেরিকাকে ভালোবেসেছে। 'গেম অফ ফরফিটস' খেলছে তার সঙ্গে। এই খেলাটার মজা কী জানেন ? মেয়ে যদি হারে তবে জয়ী পুরুষ তাকে চুমু খাবে। গ্যেটে এমন ভাবে খেলতে লাগল—'

'যাতে প্রতিবারই সে জেতে।'

'মোটেই তা নয়। যাতে প্রতিবারই সে হারে। যাতে ফ্রিডেরিকাকে চুমু খেতে না হয়।'

'তাতে তার লাভ?' দিবাকর নিরাসক্তের মত বললে।

'অপূর্ব সংযম দেখিয়ে ফ্রিডেরিকার বাপ-মায়ের কাছ থেকে মর্যাদা কিনে আরো বেশি ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ করে নেওয়া। বুঝলেন না, খেলার চুমুতে, খেলা-খেলা চুমুতে, গ্যেটে রাজি নয়। হলও তাই। যেদিন বিদায় নিতে যায়, সংযমকে সম্পূর্ণ যমের বাড়ি পাঠিয়ে ফ্রিডেরিকাকে টেনে নিল বাহুর মধ্যে আর বার-বার বার-বার—' কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে শান্তস্বরে বললে, 'আপনার এমনি গ্যেটে হতে ইচ্ছে করে না?'

'ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন!' কায়দা করে বললে দিবাকর।

'অভিশাপ দিলেই কি ফলে? রক্ষে পান কি না পান, এটা ঠিক যে কবি হতে পাচ্ছেন না। আপনি যে আর কবিতা লিখতে পারছেন না তার কারণই আপনার জীবনে আর প্রণয়িনী নেই, উত্তেজনা নেই—'

'অনেক কিছুই হতে পাচ্ছি না। হাইকোর্টের জজ হতে পাচ্ছি না।' ভীরুকণ্ঠে হাসল দিবাকর।

'একবার দুই বোনকে একসঙ্গে ভালোবাসল গ্যেটে।' লীনা ক্লান্তের মত হেলান দিয়ে বসল। 'এক নাচ-শিখিয়ের দুই মেয়ে—এমিলিয়া আর লুসিন্দা। এমিলিয়ার আবার অন্য প্রেমিক ছিল কিন্তু গ্যেটেকে দেখে সে পথ ভুলল। গ্যেটেকে বললে, তোমার এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত, নইলে তুমি সব ডোবাবে, সত্য শান্তি ত্যাগ ধর্ম—সমস্ত। আমি সত্যচ্যুত হব, লুসিন্দা ধর্মচ্যুত হবে। আমি লুসিন্দার জন্যে পারব না ত্যাগ করতে আর লুসিন্দাও আমার জন্যে পাবে না শান্তি। সুতরাং তুমি চলে যাও। বিদায় নিচ্ছি তোমার থেকে—তুমি এই নাও আমার প্রথম ও শেষ চুম্বন। ঠিক সেই সময় রাত্রির হালকা পোশাকে আবির্ভূত হল লুসিন্দা, এমিলিয়াকে উদ্দেশ করে বললে, শুধু তুমিই ওর কাছ থেকে বিদায় নেবে না। বলে গ্যেটের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে

পড়ল, চুমু খেল, আর গ্যেটেকে বললে, তোমাকে শাপ দিচ্ছি। চিরদুঃখ তার যে আমার প্রথম এই ওষ্ঠাধর চুম্বন করল— কঠিন কণ্ঠে ধিক্কার দিয়ে উঠল লীনাঃ 'কিন্তু গ্যেটে চলল নতুনের সন্ধানে, এলিজাবেথ শ্যোনেমান বা লিলির বাড়ির দিকে।'

'তার মানেই লুসিন্দার শাপ ফলল না।' একটু বা বিদ্রূপ করে উঠল দিবাকর।

'ভবিষ্যতের কথা কে কার হিসেব করে? তবু লুসিন্দা পেয়েছিল এক মুহূর্ত। দৈব উপহার দেয়নি, নিজেই উদ্যোগ করে আদায় করে নিয়েছিল। এক মুহূর্তই তার এক সমুদ্রের সমান—'

কিছুক্ষণ কাটল চুপচাপ। ট্যাক্সি ঢুকল কলকাতায়।

গাঢ় নিম্নস্বরে লীনা বললে, 'ড্রাইভারকে বলুন না একটু গঙ্গার ধার দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে। ফোর্ট, ডক, খিদিরপুর—'

ড্রাইভার বললে, 'ফুরন করা গাড়ি, পারব না ঘুরতে।'

'এ কে কথা কইল? দৈব, না, আর কেউ?' লীনার মুখের দিকে তাকাতে চাইল দিবাকর।

কথা বলল না লীনা।

একটা রাস্তার মোড়ে আসতেই হঠাৎ বললে, 'দাঁড়ান, নামব এখানে।'

দাঁড়াতেই নেমে পড়ল। কোন দিকে গেল বোঝা গেল না।

দিবাকর জানত এর পর আবার একটা চিঠি আসবে।

এবারের চিঠির ভাষাটা আরো বেশি উগ্র। লিখেছেঃ 'ভেবেছিলাম একটা ঘটনাতেই আপনার শিক্ষা হবে। আপনার অন্তর্নিহিত মার্জিত-বুদ্ধিবশতই আপনি আশ্রয়-প্রার্থিনী ভদ্রমহিলার মান বাঁচাবেন। কিন্তু আপনারা সমাজের কৃকলাশ, বহুরূপী, ক্ষণে-ক্ষণে রঙ বদলানোর খেলোয়াড়। কিছুই দৈব নয়, সমস্তই আপনার ইচ্ছার রচনা। নইলে ফুরনের ট্যাক্সিকে বাড়তি ভাড়া কবুল করে কলাকাতা শহরের নির্জনতর অঞ্চলগুলিতে ঘোরবার কী অর্থ হতে পারে? একজন বিশ্বাসী ভক্ত মেয়েকে—'

তাড়াতাড়ি শেষের অনুচ্ছেদে চোখ রাখল দিবাকর। এবার একটা স্থূল ব্যবস্থার কথা ভেবেছে। লিখেছে ঃ 'ঘুণাক্ষরেও ভাববেন না এ আমি মুখ বুজে সহ্য করব। আমি থানাতে প্রথম এত্তেলা পাঠালাম।'

থানা থেকে কখন লোক আসে এনকোয়ারিতে, দিনের পর দিন অপেক্ষা করছে দিবাকর, একদিন দুপুরবেলা অফিসে স্বয়ং লীনাই এসে উপস্থিত হল সশরীরে।

কিন্তু এ তার কী চেহারা!

হাতে-গলায় গয়না, ভয়ঙ্কর সেজেছে লীনা, রঙিন ভয়েলের শাড়ির পাড়টাও ঢালা লাল। কিন্তু আসল লাল তার কপালে, তার মাথায়।

'এ কী?'

'বিয়ে করেছি।' হাসতে হাসতে লীনা মুখোমুখি চেয়ার টেনে বসল।

'কী করে?'

'ঐ রাজনীতি করেই। বাজনীতিতেও যখন হল না—'

'বাজনীতি?' কথাটা যেন নতুন লাগল দিবাকরের।

'বাজনীতি মানে বাজপাখির নীতি। বাজপাখির মত ছোঁ মেরে তুলে নেওয়া—'

'হল না বুঝি?'

'তাই রাজনীতিকেই আশ্রয় করে রইলাম। পার্টিই বর জুটিয়ে দিলে।'

'ভালো কথা। রাজনীতিতে অন্তত একটা কাজ হল। কিন্তু বরটি কে, পার্টি ছাড়া আর কিছু কাজ করেন?'

'করেন।' ব্যাগ খুলে একটা কার্ড দিল লীনা।

কার্ডে চোখ রেখে দিবাকর বললে, 'কিন্তু এ তো দেখছি বেশ বড় সম্ভ্রান্ত ফার্ম—'

'ও সব রাখুন। আমি আপনার কাছে খুব বিপদে পড়ে এসেছি।'

আবার বিপদ! আবার আশ্রয়প্রার্থনা!

'এখন আর তোমার বিপদ কী!' অন্যদিকে মুখ করে দিবাকর বললে।

'ভিতরের বিপদ নেই বটে কিন্তু এবার বিপদ বাইরে।'

'কেন, কী ব্যাপার?'

'যে অঞ্চলে বাসা নিয়েছি—বাসা মানে দোতলার ছোট একটা দুজনের ফ্ল্যাট—সে পাড়ার কতগুলো লোক—ছেলেছোকরাই বেশি—আমাদের পিছনে লেগেছে। ওঁর তত নয় যত আমার। নানারকম টীকা-টিপ্পনী ঝাড়ছে, গান বাঁধছে, শিস দিচ্ছে। যাকে রকবাজি বলে—তারো চেয়ে অধম। প্রথম-প্রথম উপেক্ষা করেছি, পরে যখন প্রতিবাদ করতে গেছি দুজনে, তখন ইটের টুকরো জিভে না নিয়ে হাতে তুলে নিয়েছে। অনবরতই ছুঁড়ছে আমাদের ঘরের উদ্দেশে। রাস্তায় বেরুলে, কখনো কখনো রাস্তায়। আমার স্বামীকে বলেছে, ঠ্যাং ভেঙে দেবে—'

'কোনো কারণ আছে?'

'একমাত্র কারণ ওদের ক্লাবের কেন মেম্বর হই না, কেন ওদের জলসাতে জয়েন করিনি—'

'থানায় জানিয়েছ?'

'জানিয়েছি, কিন্তু স্থায়ী ফল হচ্ছে না। আপনি যদি যান, যদি ওরা বুঝতে পারে আপনি আমাদের লোক তা হলে ওরা ভয় পাবে। থানাকে তখন বললে চব্বিশ ঘণ্টা খাড়া রাখবে পাহারাওলা।'

'যাব। কাল যাব।' দিবাকর জিগগেস করল: 'কখন যাব বলো তো?'

'দুপুরবেলা। ঠিক এমনি সময়।' গলার স্বরটা খাদে এসে কেমন কেঁপে উঠল লীনার।

'ভর দুপুরবেলাতেই বুঝি উৎপাত বেশি?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় কাত করে লীনা হাসল।

'পরে আবার তিরস্কারপত্র পাঠাবে না তো?'

'না, না, আর পাঠাব না।' খিল খিল করে হেসে উঠল লীনা: 'বরং, যদি বলেন, পুরস্কারপত্র পাঠাব। এখন আর ভয় কী! এখন আমিও নিশ্চিন্ত, আপনও নিশ্চিন্ত—'

'তা বটে!'

'যাবেন কিন্তু ঠিক।' অফিসে কতক্ষণ আর বসবে, লালের ঝলক দিয়ে বেরিয়ে গেল লীনা।

সংশ্লিষ্ট থানায় টেলিফোন করল দিবাকর। নালিশটা সত্যি।

তবু পাড়াটা একবার দেখে এলে মন্দ কি। আর পাড়ার মধ্যেই তো লীনাদের বাসা। সে বাসাতে না গেলেই বা কী করে বুঝবে কোথায় এসে ঢিল পড়ে, কোন দিক থেকে?

সে বাসার শয়নকক্ষে না ঢুকলে কী করে বুঝবে এ অঞ্চলের দুপুরটা কেমন নিঝুম, কেমন থমথমে?

কেমন বা একা-একা লীনা? কেমন বা সে এখন স্বল্প, লঘু, শিথিল?

'আসুন। পর্দা সরিয়ে ভিতরে ডাকল দিবাকরকে।

খাটে নির্মল বিস্তারে নিভাঁজ বিছানা—দিবাকর গেল চেয়ারের দিকে। বসল। বসেই আবার উঠে পড়ল। বলল, 'হ্যাঁ, বলো তো কোন্ দিক থেকে ঢিল আসে?'

'কোনো দিক থেকেই আসে না। বসুন।' দরজা আড়াল করে দাঁড়াতে চাইল লীনা।

দিবাকর বসল চেয়ারে। বসে বসে দেখতে লাগল চারদিক।

'আচ্ছা, আমার উপর আপনার রাগ হয় না?' চুলগুলি খসা, লীনা কাছে এসে দাঁড়াল। 'ইচ্ছে হয় না আমার সমস্ত অহঙ্কারকে ধুলো করে দিতে?' লীনার চোখ ছলছল করে উঠল: 'একটা দুর্বিনীত উদ্ধত মেয়ে আপনার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করবে, তবু দণ্ডধর হয়েও আপনি তার শাস্তি দেবেন না?' উচ্ছ্বাসগরিমায় একটা ময়ুর যেন পেখম মেলে দাঁড়াল চোখের সামনে।

কার জুতোর শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। আর স্বচ্ছন্দে নিশ্বাসটা পড়বার আগেই দরজার পরদা সরিয়ে দেখা দিল একটি প্রিয়দর্শন লাজুক যুবক। দু হাত তুলে নমস্কার করল দিবাকরকে।

'তুমি এখন ? এ সময় ?' লীনা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

'বা, উনি আমার অফিসে টেলিফোন করলেন যে উনি আসছেন তদন্তে। আমার সাহায্য চান। তাই ছুটতে ছুটতে আসছি।' যুবক বিনীত মুখভাব করে তাকাল দিবাকরের দিকে। 'কিন্তু উৎপাত তো দুপুরের দিকে হয় না। হয় সন্ধে থেকে—'

'চলুন পাড়ার ক্লাবটা দেখে আসি।' বেরুবার উদ্যোগে উঠে দাঁড়াল দিবাকর।

'চলুন।' পথ দেখাবার কর্তব্যে এগিয়ে গেল যুবক।

দরজার কাছে এসে ঘুরে দাঁড়াল দিবাকর। তাকাল ঘরের দিকে। মেঘে-মেঘে মোছা জ্যোৎস্নার দিকে। একটা স্ফুট রেখা কী ভাবে ধীরে ধীরে লীন হয়ে যাচ্ছে তার দিকে।

দিবাকর বললে, 'শাস্তি কোথায়, শান্তি। আর এই অদ্ভুত শাস্তিও দৈবই বিধান করে। আর,' হাসল দিবাকর : 'আর, তুমি তো জানো, যে দৈব মানুষেরই রচনা।'

বাইরে বেরিয়ে এসে যুবক বললে, 'আপনি এখন বৃথাই এসেছেন—'

হ্যাঁ, বৃথাই। ক্লাবঘরটা এখন বন্ধ।

ছাত্রী

আলো-না-জ্বালা বাইরের ঘরে বসে একা-একা মদ খাচ্ছে শিবতোষ। পর্দার বাইরে কার ছায়া দুলে উঠতেই জিগগেস করলে : 'কে ?'

'আমি।'

'ভেতরে আসুন।'

বিমান ঘরে ঢুকল।

'ও! আপনি ?' কণ্ঠস্বরের তাপ জুড়িয়ে গেল নিমেষে। দরজার দিকে তাকিয়ে বললে, 'যান, উপরে যান। মানসী আছে তো ?'

'থাকবার তো কথা।'

'কিন্তু গিয়ে হয়তো দেখবেন, বাড়ি নেই, সিনেমায় গিয়েছে।'

'তা হলে, মন্দ কী, ফিরে যাব। মাগনা একদিন ছুটি মিলে যাবে।'

'হ্যাঁ, তা যাবে। কোনো উপায় নেই।' সিগারেটে টান দিল শিবতোষ। 'কী পড়াচ্ছেন ?'

'জুলিয়স সিজর।'

'ভালো। পড়ান। ভালো করে পড়ান। একমাত্র মেয়ে—মেয়ে কী, একমাত্র সন্তান—খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠুক—এই আমার একমাত্র স্বপ্ন।' গ্লাশে চুমুক দিল শিবতোষ।

'হ্যাঁ, চেষ্টা করছি, যাতে ভালোভাবে পাশ করতে পারে।' বিমান দরজার দিকে এগুবার ভঙ্গি করল। 'তা মানসী বেশ পড়ে।'

পর্দা প্রায় ছুঁয়েছে, শিবতোষ পিছু ডাকল। বললে, 'পড়েই বা কী হবে ? শুধু পড়লে, পাশ করলে, বিয়ে হলে বা চাকরিবাকরি করে টাকা রোজগার করলেই কি উজ্জ্বল হয় ? আচ্ছা, শুনুন—'

বিমান ফিরল।

'বসুন না একটু।'

টেবিলের কাছ ঘেঁসে আরো একটু এগুলো বিমান। বসল না।

'আপনি এসব খান ?'

'না।'

'কোনোদিন খেয়েছেন ?'

'না। দরকার হয়নি।'

কথাটা কেমন একটু অন্তরঙ্গ হয়ে বাজল। চোখ তুলল শিবতোষ। 'দরকার হয়নি ?'

'না। জীবন এমনিতেই এক আশ্চর্য নেশা। ভরপুর আনন্দ।'

'ইয়ং ম্যান, বিয়ে-থা করেননি, স্বপ্নের ঘোর লেগে আছে চোখে, তাই বলছেন ঐ অপরূপ কথা! কিন্তু—' মুখের রেখা কুটিল করে তুলল শিবতোষ। 'কিন্তু যখন স্বপ্ন ভেঙে যাবে, যখন ভরাডুবির পর নদীর পাড়ে একলা পড়ে থাকবেন, তখন কী হবে ?'

'তখনকার কথা তখন।'

'দেখুন, কতখানি একলা।' মদের গ্লাশের দিকে তাকাল শিবতোষ। 'মদে পর্যন্ত যার বন্ধু নেই, বুঝুন সে কতখানি নিঃসঙ্গ।'

'সত্যি, তাই।' মমতাভরা চোখে তাকাল বিমান।

'সুখ সঙ্গ খোঁজে। দুঃখই একাকী।' করুণ করে তাকাল শিবতোষ। 'আমিও একাকী।'

চলে যাচ্ছিল, শিবতোষ আবার ডাকল।

'আপনার অনেক ছাত্রী আছে ?'

এ কী অদ্ভুত প্রশ্ন! বিমান একটু-বা গম্ভীর হল। বললে, 'কলেজে যখন পড়াই তখন অনেক আছে, এ নিশ্চয়ই বলা যায়। কিন্তু প্রাইভেটে শুধু এই একজন—মানসী।'

'প্রাইভেটে মানে ?' দিব্যি কটাক্ষ করল শিবতোষ।

'প্রাইভেটে মানে প্রাইভেট টিউশানিতে।'

'মোটে একটা ?' শিবতোষের চোখে এখনো একটু কালিমার ছোঁয়াচ।

'মফস্বলী কলেজ। প্রাইভেট টিউশানির তত রেওয়াজ নেই। আর, আপনার মত কে দেবে ন্যায্য মাইনে? কার বা অত আছে?'

'অনেক আছে, তাই না?' মদের বোতলটার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বললে শিবতোষ। হঠাৎ চমকে উঠে বিমানকে আবার লক্ষ্য করল। 'শুনুন। একটু কাছে আসুন।'

বিমান কাছে এল।

গলার স্বর ঝাপসা করল শিবতোষ। 'আপনার হাতে কোনো গরিব ছাত্রী আছে?'

'গরিব ছাত্রী মানে?'

'গরিব ছাত্রী মানে, ভালো খেতে-পরতে পায় না, পড়ার খরচ চালাতে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে, হয়তো বই কিনতে পাচ্ছে না, বাস-এ যাওয়া-আসার সংস্থান নেই বলে হয়তো দীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটে, খুব দীনহীন অবস্থা—এমন নেই কেউ?'

'কত আছে।'

'তাদের কাউকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন?'

'পাঠিয়ে দেব? কেন?' একেবারে একটা মাস্টারের মতই বললে বিমান।

'আমার অনেক—অনেক আছে। তাকে কিছু দেব।' গ্লাশে দীর্ঘ চুমুক দিল শিবতোষ। 'যদি চায়, যদি চাইতে জানে, অনেক, অনেকই তাকে দিয়ে দেব।'

'চ্যারিটি করতে চান সে তো খুব ভালো কথা।' বিমান সরল সাজবার চেষ্টা করল। 'কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে লিখলে তিনি দুঃস্থ ছাত্রীর লিস্ট পাঠিয়ে দেবেন। প্রায়রিটি বিচার করে আপনি—'

'এত কম বোঝেন বলেই তো আপনাদের মাস্টার হতে হয়েছে।' একটু বা বিরক্ত হল শিবতোষ। 'আমি তাকে এত—এত দেব, আর সে আমাকে কিছুই দেবে না?'

'সে আবার কী দেবে ?' গ্রাম্য-আনাড়ির মত মুখ করল বিমান।

'বা, টু সে দি লীস্ট য়্যাবাউট ইট, একটু সঙ্গ তো দেবে, একটু মিষ্টি কথা। জানেন,' আর্ত উত্তেজিত স্বরে বললে শিবতোষ, 'আজ প্রায় পাঁচ বছর কোনো মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথা বলিনি।'

প্রথমে চোখ নত করল বিমান। পরে উপরে তাকাল। উপরে মানে, দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির দিকে।

'বাসবী, মানে মিসেস নিয়োগীর, মানে, মানসীর মার কথা ভাবছেন ? তার সঙ্গে পাঁচ বছর আমার সম্পর্ক নেই।'

'জানি। শুনেছি।'

'কী শুনেছেন ? আমাদের মধ্যে একটাও কথা নেই। উনি ওখান দিয়ে যান তো আমি ঐখান দিয়ে যাই। আলাদা ঘর, আলাদা ব্যাঙ্ক-এ্যাকাউন্ট, সমস্ত আলাদা। সামান্য চোখের দেখা হওয়াটাও যথাসাধ্য মুছে ফেলেছি দুজনে। অথচ এক বাড়িতেই, এক ছাদের নিচেই আছি, এক হাঁড়িতে।'

'শুনেছি সব।'

'শুনেছেন ? কার কাছে শুনেছেন ?'

একটু বা থতমত খেল বিমান। বললে, 'মানে, দেখছিও তো কিছু-কিছু।'

'কী দেখছেন ? সপ্তাহে তিন দিন তো মোটে পড়াতে আসেন, তাও সন্ধের দিকে, ঘণ্টাখানেকের জন্যে।' শিবতোষ গ্লাশে আবার চুমুক দিল। 'পড়াতে এসেই তো বন্দী হয়ে যান ঘরের মধ্যে, অন্তত বইয়ের মধ্যে। তখন কতটুকু আপনার দেখা সম্ভব ? বড়জোর এইটুকু যে, এই বাড়ির কর্তা আর কর্ত্রী ঐটুকু সময়ে আপনার সামনে কথাবার্তা বলছে না। সে তো স্বাভাবিক কারণেও হতে পারে। তা থেকে কীই বা সিদ্ধান্ত হয় ? তার মানে, কিছুই আপনি দেখেননি, পারেন না দেখতে। সব আপনি শুনেছেন।'

'হ্যাঁ, স্যার, শুনেছি।' নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলল বিমান।

'আর তা শুনেছেন আপনার ছাত্রী, আমাদের মেয়ে, মানসীর কাছ থেকে।'

'তাই।'

'কতদূর শুনেছেন শুনি?'

'শুনেছি মানসীর বিয়ে পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করছেন। ওর বিয়ে হয়ে গেলেই আপনারা কোর্টে যাবেন বিবাহবিচ্ছেদের মামলা নিয়ে।'

'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, শুধু পড়া নিয়ে নয়, পড়ার বাইরের বিষয় নিয়েও আপনাদের ছাত্রী-শিক্ষকের বেশ কথা হয়?' কথাটা এমনি শুনতে একটা তিরস্কারের মত, কিন্তু শিবতোষের তরল কণ্ঠে পরিহাসের মত শোনাল।

'তা, অস্বীকার করি কী করে, হয় একটু-আধটু।' মাথা চুলকোলো বিমান। 'আর এ তো প্রাসঙ্গিক কথা।'

'সবই প্রাসঙ্গিক। আসঙ্গের কথা যদি ওঠে তাও প্রাসঙ্গিক।' শব্দ করে হেসে উঠল শিবতোষ।

বিমান মূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল।

শিবতোষ মদ ঢালল গ্লাশে। বললে, 'মানসী যখন প্রথম আপনাকে নিয়ে এল আমার কাছে, বললে, এঁকেই কোচ রাখলুম, তখনই দেখে মনে হয়েছিল, কালক্রমে অনেক প্রাসঙ্গিক কথাই উঠবে। ইয়ং ম্যান, বিয়ে করেননি, তারপর এমন ইন্দ্রের মত চেহারা—'

'ইন্দ্রের মত!' হা-হা-হা করে হেসে উঠল বিমান। বুঝতে বাকি রইল না শিবতোষ মাতাল হতে শুরু করেছে।

'সুতরাং সন্দেহ নেই, কলেজের বহু অপ্সরাই দেবরাজে আকৃষ্ট হয়েছে। শুনুন, আমি উর্বশী তিলোত্তমা রম্ভা মেনকা চাই না। একটি দুঃস্থ-দুর্গত হলেই আমার চলে। প্রমাথিনী বা ঘৃতাচী বা অলম্বুষা।' নামগুলিতে নিজেই হেসে উঠল শিবতোষ। 'বুঝলেন সুবিধে পেলে এক-আধটি দেবেন পাঠিয়ে।'

মাতালকে স্তোক দিতে বাধা কী। বিমান বললে, 'দেখব।'

পড়াতে পড়াতে হঠাৎ টেবিলের-উপর-রাখা মানসীর শিথিল ডান হাতটা ধরে ফেলল বিমান।

মানসী চঞ্চল হল না। এমন একটা ভাব করে রইল এ যেন পড়ানোর উত্তেজনায় সরল ও সমীচীন মুদ্রা। শুধু চোখ নামিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, 'মা দেখছেন।'

দ্রুত হাত তুলে নিল বিমান।

তাকাল বারান্দার দিকে। বারান্দা তো এখন ফাঁকা। তাকাল জানলা দিয়ে উঠোনের দিকে। সেখানেও তো কেউ নেই। আর থাকলেই বা কী। সেখান থেকে এই দোতলার ঘরের ভিতরটা দেখা যায় না। তবে বাসবীর কি এমন চোখ যা দেয়াল পর্যন্ত ভেদ করে?

'কই, তোমার মা তো নেই এদিকে।'

'চুপ।'

কতক্ষণ পরেই বারান্দায় দেখা গেল বাসবীকে। আপন মনে পায়চারি করছে।

খালি পা, জুতোর কোনো শব্দও ওঠেনি। পরনে এমন কোনো সদ্য পাটভাঙা শাড়ি নেই যে হাওয়াতে খসখসিয়ে উঠবে। এখানে-ওখানে কোথাও একটা ছায়ারও ছায়া পড়েনি।

তবু গন্ধ শুঁকে মানসী ঠিক বলে দিতে পারল, মা দেখছেন।

বনে, হাওয়াতে, হরিণ বুঝি এমনি দূর থেকেই বাঘের আভাস পায়।

বাসবী ফের ঘুরে যেতেই সতর্ক ভঙ্গিটা শিথিল করল বিমান। টেবিলের নিচে খালি পা মানসীর খালি পায়ের উপর এনে রাখল।

এতটুকু চমকাল না মানসী। শুধু বললে, 'ভয়ানক মামুলি হচ্ছে।'

'আদ্যোপান্ত সমস্ত কিছুই মামুলি। জন্ম প্রেম মৃত্যু সব কিছুই সেই সেকেলে, একঘেয়ে, সকলের মুখস্ত। কোথাও বৈচিত্র্য নেই। বিস্ময় নেই।'

'তবু যে শিল্পী, যে কবি সে তারই মধ্যে আঙ্গিকে নতুনত্ব আনে। সেইটিই স্বাদে তার আনে, ধার আনে, বিস্ময় ঘটায়।'

'মাঝখানে এই টেবিলটা রেখে আমি কী আর নতুনত্ব দেখাতে পারি?' ব্যস্ত হয়ে বিমান বললে।

'যখন পারেন না, চুপচাপ পড়িয়ে যান।'

'মাঝে মাঝে চুপচাপই তো পড়াতে চাই।' হাসল বিমান। 'মানে, পড়াতে পড়াতে চুপ করে তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। কখনো বা তোমার হাত ধরি, পা ধরি, কখনো বা একগুচ্ছ চুল। তখন আর অন্যের কবিতার মানে নয়, তখন নিজের কবিতার মানে তোমাকে নিঃশব্দে বোঝাতে চাই। ঠিকই বলেছ, সেই আমার চুপচাপ পড়ানো।'

'এখন শিগগির চেঁচিয়ে পড়ান।' মানসীই এবার পা দিয়ে ধাক্কা মারল।

একটা ইংরাজী কবিতার আবৃত্তিতে লেগে গেল বিমান।

আবার ঘুরে গেল বাসবী।

'জানেন, মা ঠিক বুঝতে পারবেন এই কবিতাটা পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, আপনার প্রক্ষেপ।' ভয়মাখানো চোখে মানসী বললে।

'আর টেবিলের নিচে তোমার ঐ নিক্ষেপটা?' খুশি মাখানো চোখে বললে বিমান।

'ওটাও মার চোখ এড়াবে না। জানেন, সব মা দেখতে পান, কিছুই তাঁর কাছ থেকে লুকানো যায় না।'

'টেবিলের নিচেটা যখন দেখতে পান তখন বুকের হাড়মাস চামড়ার নিচেটাও দেখতে পান নিশ্চয়।'

'ঠিক পান। কী রকম চোখ হয়ে গেছে দেখেছেন? কত রাত একফোঁটা ঘুমুতে পারেন না, কেবল ঘুরে বেড়ান।' মানসীর মুখ পাংশু হয়ে গেল। 'আমার একেক সময় মনে হয় মা বুঝি পাগল হয়ে যাবেন।'

বাসবীকে আবার দেখা গেল। আবার ব্যাখ্যায় উচ্চঘোষ হল বিমান।

বাসবী আবার ঘুরে যেতেই বিমান বললে, 'উনি হবেন, আর আমরা হয়ে গিয়েছি।'

'হয়ে গিয়েছেন তো বাবাকে গিয়ে বলুন।'

'আর তুমি মাকে বলবে!'

'য়্যাবসার্ড! মরে গেলেও বলতে পারব না।'

'পারবে না?'

'না। মুখ দিয়ে আসবেই না কথাটা।' মানসী ঘড়ির দিকে তাকাল। 'একটা প্রাইভেট টিউটর ও তার ছাত্রীর মধ্যে প্রেম হয়েছে, তারা বিয়ে করতে চায়, এ একেবারে মান্ধাতার আমলের কাহিনী। একেবারে পুরোনো, ঝর্ঝরে লজঝর উপন্যাস। বললেই কেমন খেলো শোনায়, পাত্র-পাত্রীদের সুস্থ-সবল মনে হয় না, মনে হয় জলবার্লি খাওয়া জ্বোরো রুগী—'

'বা, পুরোনো কাহিনীই তো পুনরাবৃত্ত হবে।' যেন বাঙলায় নোট দিচ্ছে, হাতের বইয়ের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল বিমান। 'যা চিরকাল হয়ে আসছে তাই আবার হবে এতে অন্যায় বা অসঙ্গত কিছু নেই। পুরোনো বলে লজ্জিত হবার কী আছে? এই পৃথিবীটাই তো পুরোনো। রোগে পড়াটা দোষের নয়। আর রুগ্ন যখন হয়েছি তখন নিরাপদ জল-বার্লিই তো ভালো। প্রেমে-পড়ার পক্ষে বিয়ে করাটাই প্রশস্ত।'

'হয়তো তাই। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রতীক্ষা না করে উপায় নেই।' কথাটা শেষ না করেই থেমে পড়ল মানসী।

বাসবীকে আবার দেখা গিয়েছে।

'উপায় নেই কেন?' বাসবী আবার সরে যেতেই জিগেগস করল বিমান।

'বলেছি তো, ছাত্রী হয়ে মাস্টারকে বিয়ে করতে পারব না।'

'কেন, বাধাটা কী? নিষেধ কোন আইনে? মক্কেলনী তার উকিলকে বিয়ে করতে পারবে না, রুগিনী তার ডাক্তারকে, কিংবা নার্স তার রুগিকে কিংবা ড্রাইভার স্বয়ং মোটরওয়ালিকে, এমন কথা কোথাও লেখে না।'

'না লিখুক।' বিমান হাত বাড়িয়েছিল ধরতে, ত্রস্ত হয়ে হাত গুটিয়ে নিল মানসী।

'যোগের বেলায় বাধা নেই, ভোগের বেলায় বাধা! হতেই পারে না। এর মধ্যে কোনো নীতি নেই।' তপ্ত হয়ে উঠল বিমান। 'মন-দেয়া-নেয়া করবে, দেহ-দেয়া-নেয়া করবে না, ভালোবাসাবাসি করবে, বিয়ে করবে না, এটাই য়্যাবসার্ড।'

'আমি বিয়ে করব না বলেছি? আমি বলেছি প্রতীক্ষা করতে।' করুণ চোখে তাকাল মানসী।

'তোমার দেহে যৌবন আসেনি, তার জন্যে প্রতীক্ষা? না কি আমার রক্ত যথেষ্ট লাল নয়, তার জন্যে?' আগুনের শিখার মত হয়ে উঠল বিমান।

কথাগুলি বুঝি শুনতে পেয়েছে বাসবী। তার পদক্ষেপ মন্থর হয়েছে। অনেক দেরি করছে এদিকে আসতে।

'মোটেই তার জন্যে নয়।' বাসবী এসে ঘুরে যেতেই স্বরে স্বাচ্ছন্দ্য পেল মানসী। 'আপনি এ চাকরিটা ছেড়ে অন্য একটা চাকরি নিন।'

'কে দেবে? কাকে দেবে? কেন দেবে? যে ডুগডুগি বাজায় তাকে কে দেবে ঢাকঢোল?'

'তাহলে আমাকে পাশ করে চাকরি করতে দিন।'

'তুমি চাকরি করবে?'

'অন্তত একটা মাস্টারি কোন না পাব! তখন বলতে বেশ লাগবে, এক শিক্ষিকার সঙ্গে এক শিক্ষকের বিয়ে হল। বেশ নিটোল শোনাবে। হাঁড়ির মুখে ঠিক সরা এসে বসবে।' হাসল মানসী। 'কিন্তু প্রোফেসরের সঙ্গে ছাত্রীর বিয়ে, নৈব চ, নৈব চ।'

'মোটেই উপাধির সঙ্গে উপাধির বিয়ে নয়।' ভঙ্গিকে দৃঢ় করল বিমান। 'এ পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলন। সূর্যের সঙ্গে চন্দ্রমার। প্রয়াসের সঙ্গে প্রসাদের।'

'জানি না। কিন্তু লোকে আমার ভালোবাসার কোনো স্বাধীন মূল্যই দেবে না।' মানসীর চোখের কোণ কি একটু ভিজে উঠল? 'লোকে বলবে, আমি এক দুর্বল অর্বাচীন ছাত্রী, মাস্টারের প্রবলতর

ব্যক্তিত্বের কাছে সহজেই বশীভূত হয়েছি। আসলে যেটা শ্রদ্ধা তাকেই আমি ভুল করেছি ভালোবাসা বলে।'

'সেদিক থেকে তো আমার ভয় বেশি।' গম্ভীর শোনাল বিমানকে।

'ভয় ?'

'হ্যাঁ, সমালোচনার ভয়।' মৃদুরেখায় হাসল বিমান। 'লোকে বলবে, পেস্কারের ছেলে সহজেই জজসাহেবের মেয়ের প্রতাপে অভিভূত হয়েছে। আমার প্রেমকে, গরীয়ান প্রেমকে, কেউ মান দিতে চাইবে না। ভাববে, তোমার বাবাই আমাকে পাকড়েছেন আর আমি তোমার মধ্যে টাকা দেখেছি, দেখেছি বা বৈষয়িক সুবিধে। শোনো, লোকের কথায় কিছু যায় আসে না। লোকের কথায় চলছে না জগৎসংসার।' আবার পায়ের উপর পা রাখল বিমান। 'প্রেমের কোনো বিশেষণ নেই। কোনো বয়স নেই, জরা নেই, বার্ধক্য নেই, নেই কালাকাল। ভালোবাসি—এর বাইরে আর সমস্ত পরিচয় অবান্তর।'

'তবু প্রতীক্ষা না করে উপায় নেই,' মানসী আলগোছে পা সরিয়ে নিল। 'মাকে দেখছেন তো ?'

বাসবী আর এখন বারান্দায় নেই। তবু বিমান বললে, 'দেখছি।'

'কী দেখছেন ?'

'যেন বন্দিনী বাঘিনী স্তব্ধ আক্রোশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুধু বনের স্বাধীনতা নয়, স্বাধীনতার বাইরে আরো কী জিনিস যেন তার নেই। জীবন যেন তাঁকে কী স্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছে, ছাড়া পেলেই কেড়ে নেবেন নখে-দাঁতে, এমনি একটা জ্বালা ঠিকরে পড়ছে চোখের থেকে।'

মানসীর চোখ এবার স্পষ্ট ছলছল করে উঠল। বললে, 'বাবার তো তবু মদ আছে, মার কিচ্ছু নেই। কী দুঃসহ এই নিঃসঙ্গতা। কী দুঃসহ !' দু-হাতে দু'পাশের রগ টিপে ধরল সজোরে।

'মার তো তুমি আছ।'

'সম্প্রতি মা আমাকেও সহ্য করতে পারছেন না।' অকারণে বইয়ের কতগুলি পৃষ্ঠা উলটোলো মানসী। এক জায়গায় অকারণে হঠাৎ স্থির

হয়ে বললে, 'তবু আমি আছি, আমার দিকে অবিচ্ছেদ একটি লক্ষ্য রেখেছেন, এই নিয়ে খানিক বা ব্যাপৃত আছেন দিনে-রাতে। কিন্তু আমি যদি এখুনি চলে যাই—'

'এখুনি-এখুনি আর কে যেতে বলছে? অন্তত পরীক্ষাটা তো দিয়ে নেবে।'

'কিন্তু যখনই যাব তখনই তুমুল হবে বাবা-মায়ে। সে সঙ্ঘর্ষের ছবিটা কল্পনা করতেও ভয় করে।' যেন হঠাৎ হিম হয়ে গেল মানসী। 'হাতাহাতি মারামারিও রেয়াত যাবে না। কে জানে ঝগড়ার মাথায় বাবা হয়তো মাকে তাড়িয়ে দেবেন, কিংবা মা-ই হয়তো নিজের থেকে চলে যাবেন বাড়ি ছেড়ে।'

'ডিভোর্সের মামলা হবে না?'

'শুধু মামলা হলে তো ভালো। ভদ্রভাবে নিষ্পন্ন হতে পারে মামলাটা। কিন্তু আদালতের ব্যাপারের সঙ্গে-সঙ্গে বাড়িতে কী ব্যাপার চলবে তাই ভেবেই আমি শিউরে উঠছি।' মানসী এবার তার ডান হাত টেবিলের উপর অনেকখানি প্রসারিত করে দিল। 'আর তারই জন্যে এ বাড়িতে আমার অবস্থিতিটা যতদূর পারছি দীর্ঘ করছি, বিলম্বিত করছি।'

মানসীর সেই নিরালম্ব হাত অনায়াসেই নিজের হাতের আশ্রয়ে টেনে নিল বিমান। বললে, 'আর কে জানে, তোমার এ বাড়িতে থাকতে-থাকতেই হয়তো বাবা-মাতে পুনর্মিলন ঘটে যাবে।'

'ওঁরা আবার মিলবেন?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মানসী। 'অনেক বছর ধরেই চলছিল ধিকিধিকি, এখন বছর পাঁচেক একেবারে দাউদাউ। অস্পর্শ-অশব্দও যে কী ভয়ানক আগুন হতে পারে, আমি কাছে আছি সব সময়, আমি বুঝি।'

'যারা ভায়োলেন্ট পাগল তারা হঠাৎ কোনো ভায়োলেন্ট শক পেলে চট করে আবার ভালো হয়ে যায় শুনেছি।'

তেমনিই বুঝি প্রচণ্ড শক পেল বিমান যখন দেখল ঠিক দরজার ওপারে উদ্যত চোখ মেলে দাঁড়িয়ে আছে বাসবী।

তখন আবার ছুয়েকটা পড়ার কথা-টথা বলে আবহাওয়াকে লঘু করে দিল বিমান।

দেখল, বারান্দাতে বাসবী নেই। সরে গিয়েছে।

'আজ তবে এখন উঠি। পালাই।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বিমান।

কোথায় পালাবে? সিঁড়ির মুখে ধরে ফেলল বাসবী। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'একঘণ্টার পাঁচ মিনিট এখনো বাকি।'

যন্ত্রচালিতের মত নিজের ঘড়ির দিকে তাকাল বিমান।

কার ঘড়ি ঠিক-বেঠিক এ নিয়ে বিমান আর তর্ক করল না। নম্র মুখে দোষ কবুল করে নিল। বললে, 'পাঁচ মিনিটের তো হেরফের।'

'না, তাই বা হবে কেন? আপনার পুরো একঘণ্টা পড়াবার কথা।' বাসবী মুখ চোখ রুক্ষ করে তুলল। 'সামান্য কথাটা তো রাখবেন।'

এ কথার উত্তরে যে কথাটা বলা যায় তাই বললে বিমান। বললে, 'কত দিন যে একঘণ্টার বেশি থাকি, বেশি পড়াই।'

'কেউ বলে না আপনাকে থাকতে। আপনার একঘণ্টা পড়াবার কথা, কাঁটায়-কাঁটায় একঘণ্টা পড়িয়ে চলে যাবেন। বেশি থাকবার কী দরকার!' শাসনের স্বরে প্রায় তিরস্কার করে উঠল বাসবী। 'বরাদ্দ সময়ের মধ্যে পড়া আর কতটুকু, থাকার দিকে লক্ষ্য, থাকাটাই বেশি। থাকতেই বেশি সুখ।'

চুপ করে রইল বিমান।

'যদি এমনি গাফিলতি হয়, মাস্টার বদলাব বলে রাখছি।' প্রায় তর্জন করে উঠল বাসবী।

বিমান সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল নিঃশব্দে।

বিকেলে হতেই অঝোর বর্ষণ। আজ নিশ্চয়ই বিমান আসবে না।

বারান্দার দিকে পিছন করে খোলা জানলায় দাঁড়িয়ে আছে মানসী। দু-হাতে একটা করে বালা, শিক ধরে আছে। পিঠে ঝুলছে রুক্ষ বেণী। পরনের শাড়িটা ধসা, আধ-ময়লা। ভঙ্গিটাতে ক্লান্তি বুলোনো।

ভেজা জুতো নিচেই ফেলে উপরে চলে এসেছে বিমান। পা টিপে টিপে উঠে এসেছে। বারান্দা পেরিয়ে ঘরে। মানসী এত তন্ময় কিছুই টের পায়নি।

পিছন থেকে এসে মানসীর দুই চোখ টিপে ধরল বিমান।

তুমি কে, তোমাকে আমার চিনতে বাকি নেই, এমন কোনো ঘোষণার মধ্যে গেল না মানসী। চোখের উপর থেকে আগন্তুকের হাত চাইল না ছিনিয়ে নিতে। বরং সেই হাতের বেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে ঐ বৃষ্টির মতই অজস্র ধারায় ঢেলে দিল। আর, বিন্দু-বিন্দু এত বৃষ্টি ঝরলেও এক বিন্দু এখনো কম আছে সেই ভাবনায় সেই শেষ বিন্দুটি মানসীর সিক্ত অধরে স্থাপন করল বিমান।

সেই মুহূর্তে জগৎ-সংসারে কে কোথায় আছে, জেগে না ঘুমিয়ে, দু-জনের কেউই দেখতে চাইল না। থাকলে আছে না থাকলে নেই। এই বিন্দুর বাইরে সমস্ত অস্তিত্ব নিরর্থক।

'চরণ! চরণ।' চাকরের উদ্দেশে হুমকে উঠল বাসবী।

কতক্ষণ পরে চরণ এসে বিমানকে বললে, 'আপনাকে মেমসাহেব ডেকেছেন।'

ভয়ে-ভয়ে হাসল বিমান।

মানসী বললে, 'যা বলেন সব মেনে নিয়ো। অপ্রকৃতিস্থ আছেন হয়তো, তর্ক কোরো না।'

পাশের ঘরই বাসবীর। তেমনি দক্ষিণ দিকের জানলা খোলা। জলের ছাঁট আসছে মৃদু-মৃদু। বাসবী তার নিচু খাটে, খোলা চুলে বসে আছে।

দরজার পর্দা সরিয়ে বিমান ঘরে ঢুকল।

'দরজা বন্ধ করে দিন।' কঠোর স্বরে বললে বাসবী, 'তারপরে বসুন ঐ চেয়ারে। আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।'

বন্ধ করল। বসল। স্তব্ধ হয়ে প্রতীক্ষা করে রইল।

'আপনার স্পর্ধাকে বলিহারি!' বাসবী টিটকিরি দিয়ে উঠল। 'আপনি ভাবছেন আপনি মানসীকে বিয়ে করবেন?'

কথা না বলে থাকতে পারল না বিমান। স্নিগ্ধমুখে বললে, 'ভাবতে দোষ কী! হাত বাড়িয়ে না পাক, চাঁদের স্বপ্ন দেখতে বামনের পরিশ্রম নেই।'

'কিন্তু আপনি বামনের চেয়েও ছোট।' বাসবীর কণ্ঠস্বর থেকে ঘৃণা ঝরে পড়ল।

'ছোট?'

'হ্যাঁ, আপনি মফস্বলী কলেজের সামান্য লেকচারার। আর মানসী ডিস্ট্রিক্ট জজের মেয়ে। জজসাহেব আরো কত কী উন্নতি করবেন ঠিক নেই। মানসীর গরমাই আরও বাড়বে। তেজ সইতে পারবেন না। আপনার জীবন জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবে।'

চুপ করে রইল বিমান। অভিভূতের মতো রইল।

'বড়র পীরিতি যে বালির বাঁধ তা আপনি জানেন না? চাঁদ ভেবে নেবেন হাত পেতে, দেখবেন আগুনের গোলা। যার যেমন পুঁজি সেই ভেবেই তার দোকান ফাঁদতে হয়। আপনার মাইনে কত? বাড়িঘর বলতেই বা আপনার কী আছে?'

'কিছু নেই। শূন্য। বলতে গেলে, আমি তো কাঙাল।'

'তাই রাজরাণী নয়, আপনার কাঙালিনী দরকার।'

'কাঙালিনী পাই কই?' বলবে-না বলবে-না করেও বলে ফেলল বিমান।

'দেখুন তো আমিই সেই কাঙালিনী কিনা।' তরলবিহ্বল চোখে তাকাল বাসবী। 'এ বাড়িঘর সমস্ত জজসাহেবের। যখন ডিভোর্স মামলার ডিক্রি পাবেন তখন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন আমাকে, কিংবা তার আগেই। মানসী তার বাবার পক্ষে থাকবে। সেখানে থাকলেই তার সুবিধে, তার উন্নতি। আমিই অনাথিনী কাঙালিনী হয়ে যাব। তখন আমি কাকে ধরব? কে আমার আছে আপনি ছাড়া?'

মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল বিমান। মানসী যে বললে, অপ্রকৃতিস্থ,

তার মানে কী? না, মাতাল নয় তো? তবে কি মস্তিষ্কে বিকৃতি? তাও তো মনে হচ্ছে না। কোনো দিন তো শোনেনি এমন অভিযোগ।

'আপনি সাংসারিক অর্থে কাঙালিনী বলছেন?'

'না, আরো—আরো অর্থ আছে। আমি ভালোবাসায় কাঙালিনী।'

'সে কী? এ আপনি কী বলছেন?'

'কেন, আমি কি ভালোবাসতে পারি না? কত আর আমার বয়েস হয়েছে? এখনো পড়িনি চল্লিশে। দেখুন আমার চোখ। এখনো চশমা নিইনি।'

বাসবীর চোখের দিকে তাকিয়ে বিমান দেখল তাতে জল এসেছে।

'আর আমার রূপ কি এরই মধ্যে একমুঠো ছাই হয়ে গিয়েছে? আর আপনিই তো সেদিন বলছিলেন ভালোবাসায় কোন বয়েস নেই, জরা নেই, বার্ধক্য নেই, নেই কালাকাল। নেই রূপযৌবনের প্রশ্ন। বলুন, আছে?'

'কিন্তু,' ছটফট করে উঠল বিমান, 'কিন্তু, কই, আমি তো কিছু জানিনি—'

'জানতে দিইনি আপনাকে। প্রস্তুত হতে দিইনি। ছাত্রীত্বের পরিবেশ না পেলে আপনার হৃদয় খুলবে না আমার কাছে। তাই মানসী আর নয়, এবার আমি আপনার ছাত্রী হবো।'

'ছাত্রী হবেন?' চোখেমুখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিমান।

'মাস্টার বদলাব বলেছিলাম না? তার দরকার নেই। এবার ছাত্রী বদলাব। আমাকে আপনি পড়াবেন।'

'পড়বেন আমার কাছে?'

'শুধু পড়ব না, পড়তে বসলে যা হয়, সেই প্রেম করব।' জলে চোখ টলটল করে উঠল বাসবীর। 'মানে আপনি করবেন [illegible]?'

'সেই আবহাওয়া পেলে কোথা থেকে কী হয়ে উঠবে বলতে পারি না।'

'নিশ্চয়ই হাতে হাত রাখবেন, পায়ে পা
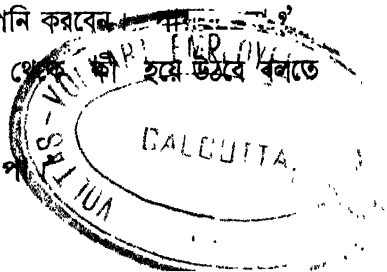
এ কি স্বপ্ন না মায়া না মতিভ্রম, বিমান কিছু স্পষ্ট বুঝে উঠতে পারল না। পাংশুমুখে বললে, 'কিন্তু যদি আপনি উচ্চপুচ্ছ সম্ভ্রান্ত হয়ে থাকেন তা হলে একেবারেই সাহস পাব না। যেমন এখন পাচ্ছি না। পালাতে পারলে বাঁচি এমনি মনে হচ্ছে।'

'বা, এখনো তো ছাত্রী হইনি। ছাত্রীর বেশ ধরিনি।' নিজের বেশবাসের দিকে তাকাল বাসবী।

'ছাত্রীর বেশ!'

'হ্যাঁ, কুমারীর বেশ। কুমারীর বেশ না ধরলে আপনার প্রেম প্রশ্রয় পাবে কী করে?'

'কুমারীর বেশ ধরবেন?' কৌতূহলে বিমানের চোখ নেচে-নেচে উঠল।

'ডিভোর্সের পর যা হব, তা দুদিন আগে হতে আর দোষ কী!' বললে বাসবী, 'আর পরিশ্রমটাই বা কোনখানে? আঁচলে চাবি না ঝুলিয়ে শুধু হবল্ দিয়ে শাড়িটা পরা, মাথার কাপড়টা ফেলে দেয়া আর চুলগুলো ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে না রেখে পিঠের উপর একটা সাপ করে ছেড়ে দেওয়া—'

'আপনাকে কুমারী ভাবতে পারলে হয়তো বা হৃদয়ে কাব্য জাগবে।' উদ্বেল হয়ে বললে এবার বিমান।

'প্রেম জাগবে বলুন। আপনাকে তখন আর সম্ভ্রমের সামনে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে থাকতে হবে না। অন্তরঙ্গের মত মুক্তবাহু হয়ে দাঁড়াতে পারবেন।'

'তখনই হৃদয়ে সুর উঠবে।'

'পরিপূর্ণের সুর।' বললে বাসবী। 'কোনোদিন জীবনে পাইনি এই আস্বাদ। কুমারী-জীবনের প্রথম রোমাঞ্চ। তাই এবার আপনি আমাকে দেবেন।'

'দেব।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বিমান। 'আপনি কুমারী সেজে ক্লান্তকায়া ছাত্রীর ভঙ্গিতে দাঁড়াবেন জানলায়, বারান্দার দিকে পিঠ করে, তাকিয়ে থাকবেন নতুন অন্ধকারের দিকে—হাতের কাছে সুইচটা থাকলেও আলো জ্বালবেন না—'

'আর আপনি ?' বাসবীও উঠে দাঁড়াল।

'বলুন—'

'আপনি পিছন থেকে এসে আমার চোখ টিপে ধরবেন। যেমন ধরলেন আজ।' শব্দ করে হেসে উঠল বাসবী। 'ধরলেন আর ধরা পড়লেন।'

'তারপর ?'

'তারপর আর বলে দিতে হবে না।' মুখটা ঈষৎ উঁচু করল বাসবী। 'তারপর সমস্ত আমার মুখস্থ। তারপর ? আরো শুনবেন ?'

দরজার খিলে হাত রেখেছে বিমান, এক মুহূর্ত স্তব্ধ হল।

'তারপর দুটি সুখী প্রাণীর উপর প্রতিহিংসা। এক মানসী আর তার বাবা। এক ঢিলে দুই পাখি! এক চুমুকে দুই সমুদ্র।' দরজার কাছ ঘেঁসে দাঁড়ালো বাসবী। 'তারপর পড়াচ্ছেন কবে থেকে ?'

'শুভস্য শীঘ্রং। কাল থেকেই।'

হ্যাঁ, কাল মানসীর ডে নয়, হ্যাঁ, কাল থেকেই।'

আলো-না-জ্বালা বাইরের ঘরে বসে একা-একা তেমনি মদ খাচ্ছে শিবতোষ।

মোটরটা বেরিয়ে গেল।

'কে গেল ?' গর্জে উঠল শিবতোষ।

উত্তর দিলে বিমান। ঘরে ঢুকে বললে, 'মানসী আর তার মা, মিসেস নিয়োগী।'

'মা-মেয়ে একসঙ্গে ? আশ্চর্য তো! গেল কোথায় ?'

'আমাদের কলেজে একটা ফাংশান আছে, সেইখানে।'

'তা আপনি গেলেন না ?'

'যাব। এখুনি যাব। মানসীর সামিল হব।'

'ও!' কী যেন হিসেব করল শিবতোষ। 'আজকে আপনার ডে নয় ?'

'না।' কানের কাছে মুখ আনল বিমান। 'আজকে আপনার ডে।'

'আমার ডে? বলো কী?' হাতের গ্লাশটা শব্দ করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল শিবতোষ।

'সেই আপনি ছাত্রী চেয়েছিলেন না?' ষড়যন্ত্রীর ইশারা করল বিমান। 'একটিকে নিয়ে এসেছি।'

'কোথায়? কোথায় রেখেছ?' গ্লাশ বোতল ফেলে হন্তদন্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল শিবতোষ।

'মিসেস নিয়োগীর ঘরে। দেখবেন, বারান্দার দিকে পেছন করে জানালার শিক ধরে আবছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। কিছু ভাবছে হয়তো, হয়তো-বা ভবিষ্যৎ ভাবছে। আপনি পা টিপে-টিপে সন্তর্পণে উঠে যান। যেন শব্দটুকুও না শুনতে পায়।'

'তাই যাচ্ছি।' খালি-পায়ে এগুলো শিবতোষ।

'শব্দ শুনলে চমকে উঠতে পারে, অকারণে ভয় পেয়ে যেতে পারে। আগে ভয় পেয়ে গেলেই সব পণ্ড।'

'না, টুঁ শব্দটিও হবে না। নিশ্বাস ফেলব না পর্যন্ত।'

'চুপিচুপি গিয়ে পেছন থেকে তরে চোখ টিপে ধরবেন।'

'চোখ টিপে ধরতে হবে?'

'হ্যাঁ, সেইটুকুই দেয়া আছে নিশানা। তার পরের টেকনিক—'

'আমাকে টেকনিক শেখাতে হবে না।'

'তার পরের টেকনিক আপনার নিজের। আচ্ছা, আমি চলি। মানসীকে দেখিগে।'

চলে গেল বিমান।

যা সে বলেছে, হুবহু, বারান্দার থেকে দেখা গেল নবীনাকে। রুদ্ধ-নিশ্বাসে পা টিপে-টিপে নিঃশব্দে এগিয়ে বাসবীর চোখ টিপে ধরল শিবতোষ।

কিছুক্ষণ পরে, কীরকম মনে হল, বাসবী সুইচ টেনে আলো জ্বালাল।

ক্ষিপ্রহাতে শিবতোষ আবার অন্ধকার করে দিল।

বাসবী বাধা দিল না।

সন্ধ্যের অন্ধকারে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে প্রায় কুঁজো হয়ে কে একটা লোক বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। আর তক্ষুনি ভিতরে ঢুকল চিন্ময়।

ভেবেছিল ঘরে সুপ্রিয়াকে একাই দেখতে পাবে। কিন্তু, না, উত্তেজিত হয়ে কার সঙ্গে তর্ক করছে। এক নজরেই বুঝল, আর কেও নয়, তার বাবার সঙ্গে। এক নিশ্বাস থমকাল চিন্ময়। কান খাড়া করল। তর্কের বিষয় সে নয়, আর কেউ। যে লোকটা এক্ষুনি চলে গেল হয় তো সেই।

সিদ্ধেশ্বরবাবুই প্রথমে লক্ষ্য করলেন চিন্ময়কে। 'এই যে চিন্ময় এসেছ। ভালোই হয়েছে। তুমিই বলো দেখি বুঝিয়ে।' বলে যেন নিষ্কৃতি পেলেন, এমনিভাবে চলে গেলেন ভিতরে।

ঘরে ঢুকে চিন্ময় জিগগেস করলে, 'কি, এত রাগ কেন ?'

'দেখ দেখি আবার আরেকটা বুড়ো ধরে এনেছেন।' সুপ্রিয়া হাসবে ভেবেছিল কিন্তু ঝলসটা টাটকা আছে বলে হাসিটা ফুটল না স্পষ্ট হয়ে।

'কে ধরে এনেছেন ?' শুকনো গলায় ঢোঁক গিলল চিন্ময়।

'আর কে! বাবা।' দ্বিতীয় চেয়ারটা টেবিল থেকে দূরে সরিয়ে এনে চিন্ময়ের দিকে এগিয়ে দিল সুপ্রিয়া। বললে, 'এ ব্যাপারে আমারই চয়েস্ থাকবে তো! তা নয়, বাবার যত কাণ্ড। বুড়ো ছাড়া আর মানুষ নেই দুনিয়ায়।'

'কে বুড়ো ?' হাত বাড়িয়ে চেয়ারের হাতলটা ধরল চিন্ময়ঃ 'পাত্র ?'

'তোমার মাথা।'

'তবে ?'

'মাস্টার।'

'মাস্টার!' এতেও কম বিস্ময় নাকি চিন্ময়ের?

'হ্যাঁ, প্রফেসর।' কথাটার মর্যাদা বাড়াল সুপ্রিয়া।

'কার জন্যে?'

'আর কার!' সুপ্রিয়া নিজের দিকে ইঙ্গিত করল।

'তোমার আবার প্রাইভেট টিউটর লাগে নাকি? কই, জানতাম না তো।'

মুখ ভবে সুন্দর করে হাসল সুপ্রিয়া। অনুচ্চে বললে, 'যদি প্রাইভেটে স্ট্যুটার লাগে তবে ট্যুটার কী দোষ করল!'

'কী পড়ায় তোমাকে?'

'পড়াল কোথায়? কাজে লাগবার আগেই তো তাড়িয়ে দিলাম।'

'তাড়িয়ে দিলে!' স্তম্ভিতের মত তাকাল চিন্ময়। 'কিন্তু কী পড়াবার জন্যে এসেছিল, মানে, ডেকেছিলে ভদ্রলোককে?'

'বাঙলা।'

'বাঙলা মানে?' চিন্ময় বুঝি আবার ধাক্কা খেল।

'বাঙলার আবার মানে কী?' একটু বা বিরক্ত হল সুপ্রিয়া: 'বাঙলা মানে বাঙলা।'

চিন্ময় ভেবেছিল বসবে না। কিন্তু ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠছে অনুভব করে বসল চেয়ারে। বললে, 'কিন্তু বাঙলা তো আমরা সব সময়েই বলছি, পড়ছি, গান গাইছি, গালাগাল দিচ্ছি, স্লোগান তুলছি, বক্তৃতা মারছি, সওয়াল-জবাব করছি—তার আবার পড়ানো-শেখানো কী!'

'আহা, বাঙলা মানে আমার বি-এর বিষয়।' সম্ভ্রান্ত দেখাবার মত মুখ করতে চাইল সুপ্রিয়া: 'আমার বাঙলায় অনার্স।'

'তার মানে যদি তুমি বি-এ পাশ করে এম-এ পড়,' প্রায় মাথায় হাত রাখল চিন্ময়: 'তুমি বাঙলায় এম-এ হবে? বঙ্গনবীশ হবে?'

'কেন, বাঙলায় এম-একে তোমার পছন্দ নয়?'

'না, না, তোমাকে আমার পছন্দ। তা তুমি এম-এ বঙ্গেই হও বা রঙ্গেই হও। কিন্তু আমি ভাবছি যা না বিষয়, তার আবার মাস্টার! যা না গাঁ, তার আবার মাঝের পাড়া!'

'বিষয়ের কথা বোঝ তোমার সাধ্য কি।' এবার স্পষ্ট চটেছে সুপ্রিয়া: 'তুমি বিজ্ঞানের মত্ত-হস্তী, তুমি সাহিত্যের রস বুঝবে কি করে?'

'তোমার সঙ্গে সহিত হবার যে রস সেও তো সাহিত্যেরই রস। তা বুঝেই আমি ডগমগ।'

হাসল সুপ্রিয়া। স্বস্থ হল।

'কিন্তু ঐ ভদ্রলোককে তুমি তাড়ালে কেন?'

'বুড়ো বলে।' তাকের থেকে একটা বই টেনে নিল সুপ্রিয়া।

'সেকি? ওর একমাত্র অপরাধ ও বুড়ো? আর কোনো অযোগ্যতা নয়, শুধু বয়সের অযোগ্যতা?'

'নিশ্চয়ই। বয়সের অযোগ্যতা। বয়সে যার মাত্রাজ্ঞান নেই, তার কিছুতেই নেই।' বইয়ের মধ্যে চোখ রাখল সুপ্রিয়া।

'বলো কি? বুড়োই তো মেয়েদের মাস্টারিতে 'সেফ'।'

'ভুল! ভুল!' তপ্ত হয়ে উঠল সুপ্রিয়া। বইটা রেখে দিল টেবিলে। বললে, 'বুড়ো হচ্ছে পুকুরপাড়ে বসা চোখবোজা বক। মিটমিটে শয়তান।'

চিন্তিত মুখে চিন্ময় বললে, 'কিন্তু, যে ভদ্রলোককে তাড়িয়ে দিলে তিনি কোনো অসঙ্গত ব্যবহার করেছেন?'

'না, না, ওঁকে তো বসতেই দিই নি। ওঁকে তো পত্রপাঠই জবাব দিয়েছি। যেই দেখলাম বুড়ো, পাকা চুল, বললাম, মাপ করবেন, চলবে না।'

'কেন চলবে না?'

'ওঁর আগে যাঁকে রেখেছিলাম তিনিও অমনি বুড়ো, পাকাচুলো, অথচ বুড়ো হওয়া সত্ত্বেও দিব্যি দুর্ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে।'

প্রকাণ্ড ধাক্কা খেয়ে এক নিশ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেল চিন্ময়।

'তখন থেকে ঠিক করেছি জরদ্গবকে আর নয়।' বলতে লাগল সুপ্রিয়া: 'হিপক্রিট বুড়োর চেয়ে অনেস্ট যুবক বা ফ্র্যাঙ্ক প্রৌঢ় অনেক ভালো। প্রথম-প্রথম আমারও তমনি কুসংস্কার ছিল যে বুড়োরাই নির্দোষ, নখ-দন্তহীন। কিন্তু ওদের পড়া দাঁতের মাড়িতে যে নতুন দাঁত গজায়, আঙুলের ডগার মাংসের থলেতে যে বাজপাখির নোখ লুকোনো থাকে তা টের পেলাম ঐ বুড়োর মধ্যে।'

'কে সেই বুড়ো?'

'কে জানি কে। বাবাকে বললাম বৈষ্ণব-সাহিত্যটা ভালো করে বোঝাতে পারে এমন একজন জ্ঞানীগুণী পেলে মন্দ হত না। বাবা কোত্থেকে এক পণ্ডিত ধরে নিয়ে এলেন। রিটায়ার করেছেন, ষাট-বাষট্টি বছর বয়েস, সৌম্য শান্ত মূর্তি, দেখে বেশ শ্রদ্ধাই হল। যারা গোঁফ রাখে তাদের যখন গোঁফ পাকতে থাকে তখনই তারা কামিয়ে ফেলে। কিন্তু এঁকে বেশ সরল দেখলাম। পাকা গোঁফই ডিসপ্লে করে আছেন। ভেবেছিলাম পেটেমুখে এক হবেন হয়তো—'

'কিন্তু করলেন কী?'

'প্রথম দিন—মানে, সন্ধেয় পরাবার সময়—বারে-বারেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে লাগলেন। ভাবখানা, যেন এমন ঢল-ঢল মুখ কোথাও দেখেন নি। টেবলের উপর ওঁর একটা হাত নিসপিস করছিল অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু সেটার লক্ষ্য যে টেবলের উপরকার আর কোনো বস্তু নয়, বইয়ের উপরে আমারই খোলা হাত, তা বুঝিনি। হঠাৎ এক সময় আমার হাতটা ধরে ফেললেন। এমন নিটোল মণিবন্ধ যেন কোনোদিন দেখেননি এমনি আহ্লাদে দেখতে লাগলেন ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে। যেন বুড়ো খোকা নাড়ু পেয়ে হাত ঘোরাচ্ছেন।'

'এত দূর!'

'প্রথম দিন ঠিক মানচিত্রটা বুঝতে পারিনি, তাই চুপচাপ ছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় দিন যা করল—'সুপ্রিয়া রি-রি করে উঠল।

'দ্বিতীয় দিন ?'

'হ্যাঁ, দ্বিতীয় সন্ধে। বুড়ো এসে প্রথমটা খুব ভালো থাকল, প্রায় হিমগদগদ গন্ধ। কিন্তু পড়িয়ে চলে যাবার সময় ঘরের বাইরে যেই একটুখানি এগিয়ে দিতে এসেছি, অমনি তার রূপ বদলে গেল, মানে স্বরূপ ধরল।'

'কী ধরল ?'

'মানে আমাকে ধরল। আমাকে ধরে আদর করতে চাইল।'

'তুমি কী করলে ?'

'আমি সজোরে ওর হাতটা ছুঁড়ে দিলাম। বললাম, ন্যুইসেন্স !'

'শুধু এইটুকু ?'

'হ্যাঁ, ছুটে চলে এলাম ঘরে। ওখান থেকে বললাম চেঁচিয়ে, আর আসবেন না পড়াতে। সশব্দে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলাম।'

'ভালোই করেছ।' উঠে পড়ল চিন্ময়। 'যৌবনই সরল, যৌবনই স্পষ্ট। তার যজ্ঞ পণ্ড হতে পারে, কিন্তু, আর যাই হোক, সে নিজে ভণ্ড নয়।

'না, না, পণ্ড হবে কী! তুমি বোস।' চোখে হোমের আলো নিয়ে তাকাল সুপ্রিয়া: 'আরো একটু বোস।'

কিন্তু যজ্ঞ বুঝি পণ্ডই হতে চলেছে। জনার্দন বললে, কেমন দেখলে ?

অনেক বই-খাতা পুঁথি-পত্র থেকে বেরিয়ে এল বেণুলাল। হাতে দুখানা কুষ্ঠি। বললে, 'পুঙ্খানুপুঙ্খ করে পরীক্ষা করলাম—'

'কী পেলে ?'

'মিলল না।'

'মিলল না ?' হতাশের মত মুখ করল জনার্দন।

'মিলল না বললে কম বলা হল। দুর্ধর্ষ অশুভ।' কণ্ঠস্বরে দৃঢ় হল বেণুলাল: 'এ বিয়ে চলবে না।'

কতক্ষণ জনার্দন চুপ করে রইল। পরে বললে, 'তুমি যখন বলছ

চলবে না, তখন চলবেই না।' বসি-বসি করেও উঠে পড়ল শেষ পর্যন্ত। 'নইলে এমনিতে মেয়েটাকে সবার পছন্দ হয়েছিল, ছেলেটারও শুনেছি কিছুটা জানাশোনা, নির্বিঘ্নে বেশ হয়ে যেতে পারত বিয়েটা। কিন্তু তুমি যখন বলছ, পরিণাম অশুভ—'

'নিদারুণ অশুভ।'

'তখন আর কথা নেই, সম্বন্ধ ভেঙে দিতে হবে। দৈব-টৈব মানি না। কিন্তু তোমার কথা আমার কাছে বেদের চেয়েও বেশি।'

'আমার কথা কী, অঙ্কের কথা, বিজ্ঞানের কথা।' বললে বেণুলাল।

'তাই আমার কাছে আপ্তবাক্য।'

বাড়িতে এসে জনার্দন বললে সবাইকে, বেণুলাল এ সম্বন্ধ বাতিল করে দিতে বলেছে। মেয়ে দুর্লক্ষণা।

বেণুলাল যখন বলেছে তখন তার উপরে আর কথা নেই। শুধু সাহিত্যে পণ্ডিত নয়, জ্যোতিষে পণ্ডিত। জনার্দনের বন্ধু। সমস্ত পরিবারের হিতার্থী।

চিন্ময়ও শুনল কথাটা। যেন কর্ণের রথের চাকা হঠাৎ ডুবে গেল ভূতলে।

এক নিশ্বাসে পথটুকু শেষ করে দিয়ে এল। বেণুলাল তার পুঁথিপত্রের উত্তপ্ত নিভৃতিতে বিশ্রাম করছিল বিছানায়, পায়ের কাছে বসল নিঃশব্দে। বেণুলাল একটু নড়ে-চড়ে উঠতেই ডাকল, 'কাকাবাবু'।'

চোখ চাইল বেণুলাল। পা গুটিয়ে নিল। বললে, 'কিরে, কী হয়েছে? এই অসময়ে?'

ঝোপঝাড়ে না ঘুরে সোজা রাস্তায় বেরিয়ে আসাই ভালো। তবু একবার ঢোঁক গিলে চিন্ময় বললে, 'সেই মেয়েটার সঙ্গে বিয়েটাকে কি সিদ্ধ করা যায় না?'

'কোন মেয়েটা?'

সুপ্রিয়া—যে মেয়েটার কুষ্ঠি বাবা আপনাকে দিয়েছিলেন দেখতে?'

'কার সঙ্গে বিয়ে?'

আনত চোখে চুপ করে রইল চিন্ময়।

'সুপ্রিয়া মানে বিশেষার্থে সুপ্রিয়া? হ্যাঁ, বুঝেছি।' উঠে বসল বেণুলাল। খানিকক্ষণ চোখ বুজে গম্ভীর হয়ে রইল। বললে, 'না, যায় না।'

এক কোপে বলি দেওয়ার মত সংক্ষেপ।

'কেন?' ভয়ে-ভয়ে তবু জিগগেস করল চিন্ময়।

'মেয়েটা বিখণ্ডিনী।'

চিন্ময় বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল।

বিখণ্ডিনী মানে কী? কী তার লক্ষণ? কী তার ক্রিয়াকলাপ? ঘরবাড়ি পোড়াবে? স্বামী খাবে? কুলটা হবে?

'কী করবে মেয়েটা?'

'সংসার ছারেখারে পাঠাবে। নিত্য কলহ করবে। যেমন মুখরা তেমনি রূঢ়ভাষিণী। কৃপণা, হৃদয়হীনা। সর্বত্র আগুন জ্বালাবে।' বেণুলালের চোখ ক্রুদ্ধ, অগ্নিবর্ণ। যেন মেয়েটার ভবিষ্যৎ মূর্তিই রূপায়িত করছেন।

'এত সব কথা লেখা আছে কুষ্ঠিতে?' একটু বা যেন অবিশ্বাস করতে চাইল' চিন্ময়।

'নিশ্চয়ই আছে। একটা বিন্দুতেই বৃত্তের আভাস লুকোনো থাকে।'

'একটু অন্যভাবে কি কিছুতেই দেখা যায় না কাকাবাবু?' চিন্ময় কণ্ঠস্বরে প্রায় মিনতি ঝরাল।

'সে তুই দেখছিস তা আমি জানি। কিন্তু আমি যা দেখছি তা ভয়াবহ।' মুখভাবে আবার সে-ভয়াবহকে ফোটাতে চাইল বেণুলাল। 'উপায় নেই, যদি মঙ্গল দেখতে চাস যাসনে ওদিকে। ওর চেয়ে কত ভালো মেয়ে পাবি। কত ঠাণ্ডা, বিনয়ী, স্নিগ্ধ মেয়ে। তোর কুষ্ঠিতেও তো তাই লেখা—'

'তা হলে ওই হয়তো সেই—' উৎসাহিত হতে চাইল চিন্ময়।

'মোটেই নয়।' হুঙ্কার ছাড়ল বেণুলাল: 'ও মেয়েটা মর্দিনী, শদ্দিনী, সাট্টহাসা। ও চলবে না, শুভ হবে না। তোর বাবাকে তাই দিয়েছি বলে।'

'সেইটাই তো ভয়াবহ হয়েছে।' করুণ মুখে বিষাদের রেখা আরো গভীর করল চিন্ময় 'আপনি যদি বিপরীত কিছু না বলতেন তা হলে এতটুকু কোথাও ঠেকতে হত না নিশ্চিন্ত শুভেলাভে বিয়েটা হয়ে যেত এখন আপনার বিরুদ্ধ কথা শুনে বাবা বিমুখ, মা বিমুখ—'

'বিরুদ্ধ কথা মানে? সত্য কথা।'

উঠে দাঁড়াল চিন্ময়। একটু বা রোখা বাঁকা সুরে বললে, 'তৎসত্ত্বেও যদি সুপ্রিয়াকে বিয়ে করি?'

'যদি পারিস তো করবি।' পরিহাস করল না অভিশাপ দিল বেণুলাল, বোঝা গেল না। 'এখন চামড়ায় জ্বলছিস তখন জ্বলবি হাড়ে-হাড়ে, গ্রন্থিতে-গ্রন্থিতে।'

তৎসত্ত্বেও বিয়ে করা সম্ভব হলেও সহজ নয়। আর যাই হোক, এক্ষুনি-এক্ষুনি তা হয় না। দেরি করতে হয়। আর, দেরির পথ মানেই দূরের পথ।

এখন কেমন দিব্যি সহজে হয়ে যেত। জোয়ারের মুখে ছিল, বেণুলাল পালটা একটু খাটিয়ে দিলেই চলে যেত তরতরিয়ে। একটা মুখের কথায় সব ভেস্তে দিল বেণুলাল। এখন আবার নতুন জোয়ারের জন্যে বসে থাকো। নিজের পায়ে দাঁড়াও। শাঁসালো একটা চাকরি জোগাড় করো। পরিবারের মতের বিরুদ্ধে সুপ্রিয়াকে নিয়ে আলাদা ঘর বাঁধো। সে তো ঘর বাঁধা নয়, অশান্তির সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে কোমর বাঁধা।

অথচ কত সহজেই এক্ষুনি-এক্ষুনি হয়ে যেতে পারত। আর, সহজে পেলে কে যায় দুরূহে?

'তুমি জ্যোতিষের কথা বিশ্বাস করো?' ঝাঁজিয়ে উঠল সুপ্রিয়া।

'এক বিন্দু না।' চিন্ময় দৃঢ়স্বরে বললে।

'তা হলে আর ভয় কী!'

'ঠিক ভয় নয়। কিন্তু দেরি তো হয়ে যাবে। আমাদের তো এক্ষুনি-এক্ষুনি একা-একা কাণ্ডটা ঘটাবার মত আর্থিক প্রস্তুতি নেই।'

'তার আর কী করা যাবে!' আশ্বাসের সুরে বললে সুপ্রিয়া। 'তুমি ইতিমধ্যে প্রস্তুত হও, কাঠ-খড় সঞ্চয় করো। আমিও এম-এটা পাশ করি।'

'সেটা আবার আরেক অসুবিধে।'

'অসুবিধে? অসুবিধে কেন?'

'এমনি তোমার বি-এ পাশের সঙ্গেসঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেলে ভাবনা কম ছিল। বি-এ পাশকে কে আর জিগগেস করে, কী-কী বিষয় ছিল পরীক্ষায়? কিন্তু এম-এ হলেই নির্ঘাৎ প্রশ্ন করবে, কিসে এম-এ? তখন তুমি যে বলবে বাঙলায় এম-এ, সেটা আবার আরেক কণ্টক। এক্ষুনি-এক্ষুনি বিয়ে হয়ে গেলে বাঙলায় এম-এটা বলতে হত না।' চায়ের পেয়ালায় মুখ ঢেকে মৃদু-মৃদু হাসল চিন্ময়।

চিন্ময়ের ভাগ্য ভালো সুপ্রিয়াও হাসল।

এই তো কেমন সুরসিকা মেয়ে। তাকেই কিনা জ্যোতিষী বলছে বিখণ্ডিনী।

লুব্ধ অথচ বঞ্চিত চোখে তাকাল সুপ্রিয়া। বললে, 'সত্যি, এখুনি বিয়েটা হতে পারলে কী মজাই না হত!'

'দিব্যি বাবা-মার তরুচ্ছায়ায় গিয়ে থাকতে পারতাম। তাহলেই বিয়েটা বিয়ে-বিয়ে মনে হত, সংগ্রাম-সংগ্রাম মনে হত না।'

'সত্যি—' দৃষ্টি আরো মদির আরো কাতর করল সুপ্রিয়া।

'তা হলে অন্তত এখন, এমুহূর্তে, ঠোঁটে চায়ের পেয়ালা নিয়ে থাকতাম না—'

'আচ্ছা, তোমার সেই জ্যোতিষী-পণ্ডিতের নাম কী?' উত্তেজনায় প্রশ্ন করে বসল সুপ্রিয়া।

'তুমি তাকে চিনবে না।' তবু নাম বললে চিন্ময়।

'থাকে কোথায়?'

এও অবান্তর, তবু চিন্ময় একটা হদিস দিলে। 'আমাদের বাড়ির উত্তরে খানিকদূরে একটা গলি বেরিয়েছে সেই গলির মধ্যে।'

'আমার তো মনে হয়', উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সুপ্রিয়া: [illegible] টাকা [illegible] ঘুষ চায়।'

'ঘুষ?'

'তুমি যখন ব্যক্তিগতভাবে মিনতি করলে তখন যে লোকটা শুনল না তার মানেই তো তাই।' রোগ ঠিক-ঠিক ধরতে পেরেছে তেমনি গোপন তৃপ্তি সুপ্রিয়ার কণ্ঠস্বরে। বললে, 'সর্বত্রই আজ টাকার খেলা। ডাক্তারের সার্টিফিকেট। টাকা ফেললে জ্যোতিষীও তাই বিধান দেবে অনুকূলে। টাকা দিয়ে ডাক্তারের সার্টিফিকেট কেনা যায়, জ্যোতিষীর সার্টিফিকেট কেনা যাবে না? খুব যাবে।'

কঠিন রেখায় সামান্য একটু হাসল চিন্ময়। বললে, 'তুমি কাকাবাবুকে জানো না। সিদ্ধান্ত থেকে টলবার মতন মানুষ নন। তা যদি হতেন আমার মিনতিতেই কাজ হত। তুমি বরং—'

'তা হলে আর উপায় নেই।' হতাশের মত মুখ করল সুপ্রিয়া: অপেক্ষাই করতে হবে।'

'অপেক্ষা করাই শুনেছি তপস্যা করা।' উঠল চিন্ময়। বললে, 'কিন্তু সব সময়েই ভয় জেগে থাকবে, লোহা এখনো লাল কিনা, তপ্ত কিনা।'

'লোহা সব সময়েই লাল, সব সময়েই তপ্ত।' চিন্ময়ের হাতের উপরে নিজের হাত রাখল সুপ্রিযা।

চিন্ময় দেখল সে-হাত কী নিদারুণ ঠাণ্ডা, ভয়-পাওয়া, আশ্রয়-খোঁজা।

কী সুন্দর হত যদি সব সহজ হত। নিরানব্বুই করে আর একটা রান করতে পারবে না? সামান্য এক রানের মাথায় আউট হয়ে যাবে? এখন সেঞ্চুরি না করা মানে জিরো করা। নিরানব্বুয়ের পর সে জিরো করতে পারবে না।

হ্যাঁ, সে যাবে বুড়োর কাছে। ঘুষ দেবে। আগের সিদ্ধান্তকে সে খণ্ডন করাবে। বুড়ো ঠিকই বলেছে। সে বিখণ্ডিনী।

বেণুলাল কেন বিরুদ্ধ মত দিয়েছে এবং কী হলে সেই কাঠিন্যের সংশোধন হবে জলের মত বুঝতে পেরেছে সুপ্রিয়া। পুরুষের চরিত্র চিন্ময় কী জানে! সকলেই জ্বরে ভুগছে, ঘুষঘুষে জ্বরে। ঘুষ খাবার লোভে ঘুষঘুষে জ্বর।

যথাসাধ্য সতর্ক হয়েই যাবে। সুদৃঢ় হয়ে। যাবে দিনে-দুপুরে। কী আর করবে বুড়ো, একক পুরুষের ক্ষমতা কী! মোল্লার দৌড় কতদূর জানি, বুড়োর দৌড়ও ততটুকু। হয়তো একটু বেশি আদর করবে। তা বুড়োরা স্টেজে করে না? সিনেমায় করে না? তেমনি ভেবে নিলেই হয়। ও ও ছলাকলা, এও ছলাকলা।

যদি কিছু বাড়াবাড়ি করে, নখ আছে দাঁত আছে, হাতে-পায়ে শক্তি আছে, সর্বোপরি কণ্ঠনিনাদ আছে।

হ্যাঁ, বাবা, আগে লিখিত মত দাও তারপরে অলিখিত খত নাও।

যদি না শোনে, ফিরিয়ে দেয় তো ফিরে যাবে। যার মুণ্ডই কাটা গেছে তার গোঁফ কেটে নিয়ে আর কী লোকসান!

কিন্তু যদি শোনে! যদি আদায় করতে পারি।

জাগা একটা চাকরের কাছ থেকে ঘরের হদিস পেল সুপ্রিয়া। ভেজানো দরজা আস্তে আস্তে ঠেলে ফাঁক করে ঢুকল ভিতরে।

তক্তপোশে বসে ঝুঁকে পড়ে কী লিখছিল বেণুলাল, ঘরে ছায়া পড়তেই চমকে উঠল। বললে, 'কে?'

বেণুলালের বিমূঢ় তন্ময় চোখের সামনে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুপ্রিয়া। পরে ক্ষীণকণ্ঠে বললে, 'আমি সুপ্রিয়া। আপনার সেদিনের সেই ছাত্রী।'

'কে, মা, মা এসেছিস?' ব্যাকুল হয়ে উঠল বেণুলাল: 'আয়, আয়, বোস। আমি জানি তুই আসবি, তোকে আসতেই হবে।'

তক্তপোশের প্রান্তে জড়সড় হয়ে বসল সুপ্রিয়া।

শিয়রের কাছ থেকে একটা ফ্রেমে-বাঁধানো ফোটো কুড়িয়ে এনে সুপ্রিয়ার হাতে দিয়ে বেণুলাল বললে, 'একে চিনিস, চিনতে পারিস?'

একটি কিশোরীর ছবি। খানিকক্ষণ অপলকে চেয়ে থেকে সুপ্রিয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'ও রঞ্জিতা না? আমার ইস্কুলের বন্ধু?'

'হ্যাঁ, এই ছাখ তাকে লেখা তোর এক বাণ্ডিল চিঠি। এই ছাখ, য়্যালবামে তার সঙ্গে তোলা কত তোদের ইস্কুলের ছবি। তোর মতন তার বন্ধু আর কেউ নেই, কেউ ছিল না।' বেণুলালের দু চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। 'রঞ্জিতা আমাকে কবে ছেড়ে গেছে জানতাম কিন্তু দৈবকৃপায় যখন তোর দেখা পেলাম, তখন দেখলাম সে মরেনি, আমারই জন্যে স্নেহ-সেবার থালা সাজিয়ে রয়েছে। আমি তোকে চিনলাম কিন্তু তুই আমাকে চিনলি না। তাড়িয়ে দিলি। কিন্তু কই, পারলি দূরে থাকতে?'

বেণুলালের পায়ের উপর হাত রাখল সুপ্রিয়া। সজলকণ্ঠে বললে, 'আমি তাড়িয়ে দিয়েছিলাম বলে কি আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন?'

'না, না, এই ছাখ, আগের মত সব খণ্ডন করে বিস্তীর্ণ এই পাঁতি দিয়েছি। দাঁড়া, স্বহস্তে সই করে দি।' দস্তখৎ করে কাগজটা বাড়িয়ে দিল সুপ্রিয়ার হাতে। 'তুই নিজে একবার পড়ে নে। তোর চিন্ময়কে গিয়ে দেখা। তার বাপকে। শুভদিন তাড়াতাড়ি ঠিক করতে বল—'

মত নিয়ে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সুপ্রিয়া। চিন্ময়কে ধরল তার বাড়িতে। রাস্তায় টেনে আনল।

'এই দেখ, এই দেখ, তোমার কাকাবাবুর বাড়ি গিয়ে তার কাছ থেকে মত আদায় করে এনেছি। তার হাতের লেখা চেন তো?'

কাগজটা সুপ্রিয়ার হাত থেকে টেনে নিল চিন্ময়। সন্দেহ কি, বেণুলালের হাতের লেখা। বেণুলালের দস্তখৎ।

আগের গণনা ভুল হয়েছে। পুনর্বিবেচনায় দেখল, এ বিবাহ পরম শুভাবহ। কন্যা সুশুভ্রা মধু-মধুরা—কল্যাণলক্ষ্মী। তার আবির্ভাবেই সংসারের অভ্যুদয়।

চিন্ময় আনন্দে একেবারে শতখান হয়ে গেল। বললে, 'কী করে অসাধ্য সাধন করলে?'

ষড়যন্ত্রীর কানে গোপনীয় কথা বলবার মত করে গূঢ়স্বরে সুপ্রিয়া বললে, 'আমিই যে তাঁর সেই ছাত্রী ছিলাম।'

'ছাত্রী?' মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল চিণ্ময়।

তার হাতের উপরে সুপ্রিয়া নিজের হাত রাখল। লাল তপ্ত হাত। হাসিমুখে বললে, 'ছাত্রীর চেয়ে বেশি। আমি তাঁর মেয়ে।'

আগের থেকে দিন-ক্ষণ ঠিক না করে এলে দেখা হয় না।

নথির মধ্যে ক্লান্ত চোখ রাজেন্দ্রনাথ হাত নেড়ে বারণ করে দিলেন।

'এ এক সন্ন্যাসী, স্যার।' মুহুরি কানে-কানে বলার মত করে বললে।

'কেন, কোনো কেস আছে?'

'সন্ন্যাসীর কেস?' যারা উপস্থিত ছিল সন্দেহ প্রকাশ করল।

'আজকাল সন্ন্যাসীর ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স আছে, স্থাবর-অস্থাবর আছে, রাগ-দ্বেষ, লোভ-মোহ আছে, আর সামান্য মামলা-মোকদ্দমা থাকবে না?'

আপনি যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই থাকবে। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সকলে সায় দিলেন একবাক্যে। আপনি ব্যারিস্টারদের প্রধান। বিদ্বান-বিদগ্ধের শিরোমণি। আপনি বেশি জানেন। হয়তো বা শেষ জানেন।

'কেস নেই তো, চায় কী?' বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকোলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'বললে শুধু দেখা করতে চায়।'

'চাঁদা চায় বোধ হয়।' উপস্থিতদের মধ্যে কেউ বললে। 'অর্থ অনর্থের মূল জেনে হয়তো অর্থের প্রতি লালসা।'

'কিংবা হয়তো কোনো মামলার বিপক্ষ দলের লোক সন্ন্যাসীকে দিয়ে আপনাকে তুক করতে এসেছে।' যে-উকিল মামলা নিয়ে এসেছে সে বললে।

অবজ্ঞার হাসি হাসলেন রাজেন্দ্রনাথ। শিখণ্ডী পাঠিয়ে ভীষ্মকে তুক করা যায়, কিন্তু রাজেন্দ্রনাথকে বশীভূত করতে পারে, এমন কোনো শক্তি নেই।

চিরকাল সংক্ষেপ করতে চেয়েছেন রাজেন্দ্রনাথ। এক দানে বাজিমাতের মানুষ তিনি। পর্বতপ্রমাণ নথি, বস্তা-বস্তা সাক্ষ্য-প্রমাণ, গাড়ি-গাড়ি

আইন আর নজিরের কেতাব—সমস্ত কিছুর মধ্য থেকে একটি দ্রুত, তীক্ষ্ণ, বিদ্যুদ্দীপ্ত সূত্র তিনি বার করে নিয়েছেন, আর তাতেই সমস্ত রহস্যের নিরসন করে চিনে নিয়েছেন মামলা। যুক্তির পাষাণে শান দেওয়া একটি অব্যর্থ শরক্ষেপেই দুর্গজয়।

ইনিয়ে-বিনিয়ে আর যে যাই বলুক, আইনের কথাটা অত্যন্ত ছোট। পল্লববর্জিত।

'ডাকো সন্ন্যেসীকে।'

সন্ন্যাসী কাছে এসে দাঁড়াল।

চেহারা দেখে সবাই থমকে গেল। মোটেই মডার্ণ মঙ্কের চেহারা নয়। একেবারে সেকেলে। দাড়ি-গোঁফ ও জটাজুটের দণ্ডকারণ্য। হাতে গলায় একবাজ্যের মালা। সঙ্গে আবার চিমটে কমণ্ডলু। পায়ে খড়ম। গায়ে ছাইভস্ম।

মোটেই সংক্ষেপে করেনি। মনে মনে বিমুখ হলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'দিন-ক্ষণ আগে থেকে ঠিক না করে এসেছেন কেন?'

'দিন-ক্ষণ ঠিক না করে অনেকেই আসে।' হাসল সন্ন্যাসী।

'অনেকেই আসে?'

'হ্যাঁ, রোগ আসে, মৃত্যু আসে আর এই সাধুও আসে।'

কথায় যেন হেরে গেলেন রাজেন্দ্রনাথ। তাই স্বর নিজেরও অজান্তে রুক্ষ হয়ে এল। 'কী চাই?'

'আপনার বউমাকে চাই।'

বড় বেশি যেন সংক্ষেপে বলা হল, এমনিই এখন মনে করলেন রাজেন্দ্রনাথ। আরেকটু খুলে-মেলে বললে যেন ভালো হত।

'কাকে? তৃপ্তিকে? সে এ-বাড়িতে কোথায়?'

'তার মানে? আপনার ছেলে আর বউ আপনার সঙ্গে থাকে না?'

'না। আমার সঙ্গে থাকবে কেন? আমার ছেলে শঙ্কর, বিরাট ইঞ্জিনিয়ার, বিলিতি ফার্মে প্রকাণ্ড মাইনেতে কাজ করে, সে বিবাহিত, সে

থাকবে কেন আমার সঙ্গে। সে স্ত্রী নিয়ে আলাদা বাড়ি ভাড়া করে আছে। আর, তাই তো উচিত।'

'তার বয়েস তো অল্প—'

'হ্যাঁ, কত আর! পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ।'

'আর তার তো খুব অসুখ।'

রাজেন্দ্রনাথ আবার নথিতে চোখ রাখলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আজ তিন দিন। বাঁচবার কোনো আশা নেই।'

সন্ন্যাসী হাসল। মামলার হার-জিত বলে দেওয়া যায় হয়তো, কিন্তু—বাঁচা-মরা কে বলতে পারে? বললে, 'শঙ্করকে দেখবার জন্যেই তৃপ্তি-মা আমাকে স্মরণ করেছেন।'

অল্প কথায় হবার নয়। মোকদ্দমার আর্জিটা তো অন্তত সবিস্তার পড়তে হবে।

তাই বিতং করে বলুন, মামলার বিষয়টা কী।

স্ট্রোক হয়ে শঙ্কর পড়ে আছে তিন দিন। হ্যাঁ, এটাও অনাবশ্যক দীর্ঘকাল। যতদূর সম্ভব, প্রচুর-প্রচণ্ড আসুরিক চিকিৎসা হচ্ছে। এবার তৃপ্তির ইচ্ছে, দৈবিক হোক। তৃপ্তির এখনো গুরুকরণ হয়নি, কিন্তু তার বন্ধু সুপ্তির এমন এক গুরু আছেন, যিনি সিদ্ধাইয়ে সিদ্ধহস্ত। অমানুষী আধ্যাত্মিক শক্তিতে অনেক কঠিন রোগ তিনি সারিয়েছেন নিমেষে। সুপ্তির স্বামী নিশীথ জুনিয়ার ব্যারিস্টার, যদি গুরুকৃপায় সুফল কিছু ফলিয়ে দিতে পারে, তাহলে রাজেন্দ্রনাথের অনুগ্রহের রোদে সে বিলক্ষণ তপ্ত হতে পারে। তাই সে উদ্যোগী হয়ে যোগাযোগ করেছে। কত বড় ধনী ব্যারিস্টার রাজেন্দ্রনাথ, আর তাঁর ঐ একমাত্র ছেলে শঙ্কর—গুরুদেব যদি একটা ভেলকি লাগিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আর দেখতে হবে না, বিজ্ঞাপনের জোরে লাখ লাখ শিষ্য হয়ে যাবে গুরুদেবের—

'এরা সব বিলেত-ফেরত, এদের সব উচ্চশিক্ষিতা স্ত্রী, এরা যে কী করে এসব আজগুবিতে বিশ্বাস করে ভেবে পাইনে।' ভিতরে-ভিতরে গুমরে উঠলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'সব রকম চেষ্টাই করে দেখছেন।' সাধু বললে সবিনয়ে।

'কিন্তু আপনারটা কোন চেষ্টা? কী করবেন আপনি?'

'শঙ্করের মাথায় হাত রেখে নির্জনে জপ করব।'

'আর তাইতেই শঙ্কর চোখ চাইবে, জ্ঞান ফিরে পাবে? যত সব অবৈজ্ঞানিক কথা। যান মশাই, আমি ওসব অপকার্যে বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু তৃপ্তি-মা করে।'

'ওরে, এঁকে কেউ ও-বাড়িতে নিয়ে যা।' হাঁক পাড়লেন রাজেন্দ্রনাথ। 'আর যারা বিনি পয়সায় ম্যাজিক দেখতে চায় তাদেরও খবর দে।'

'আপনি যাবেন না?' যাবার আগে জিজ্ঞেস করল সাধু।

'না-না, আমার জরুরি কাজ আছে। আমাদের মশাই লজিক, ম্যাজিক নয়।' ঘড়ির দিকে তাকালেন রাজেন্দ্রনাথ।

উপস্থিত সকলে, যারা পরামর্শে এসেছে, তারা মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল। 'আপনার ছেলের অমন অসুখ, কই জানি না তো!'

'জেনে কী ফয়সালাটা হবে?'

'তিন দিন ধরে অজ্ঞান, আর আপনি কোর্ট করছেন?'

'কোর্ট করব না কেন? আমি তো আর অজ্ঞান হইনি। সূর্য-চন্দ্র তাদের কাজ করে যাবে, আমিও আমার কাজ করে যাব।' রাজেন্দ্রনাথ আবার নথিতে নাক ডোবালেন।

'কে দেখছে?'

'কে না দেখছে?' রাজেন্দ্রনাথ চোখ তুলে নিলেন আবার। 'কলকাতায় ডাক্তার-কবরেজ আর বাকি নেই। শেষকালে, দেখছেন তো, এক সন্ন্যেসী ধরে এনেছে। স্বামীর জীবনের জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছে। কোনো কিছুই আর বাকি রাখছে না। বাদ দিচ্ছে না। যত পাথর পাচ্ছে উলটে-উলটে দেখছে। শেষ পর্যন্ত শুনুন, কী কেলেঙ্কার, মানত করছে গিয়ে মন্দিরে। ঝাড়-ফুঁক করাচ্ছে, মাদুলি পরাচ্ছে।'

'আহা বেচারি!' সকলেরই সমবেদনা তৃপ্তির জন্যে।

'তিনটে নার্স আছে, তবু দিনে-রাতে একফোঁটা ঘুম যাবে না মেয়ে। সর্বক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, যদি কখনো চোখ চায়, যদি ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কোনো কথা অস্ফুটে বেরিয়ে আসে। এতখানি ধৈর্য ও প্রতীক্ষা চোখে না দেখলে কল্পনা করা যেত না। মনে হয় ও শুধু তাকিয়ে থেকেই স্বামীর চোখ চাওয়াবে, জ্ঞান আনাবে। যদি কিছু অলৌকিক থেকে থাকে সংসারে, তবে স্ত্রীর ঐ সতী শক্তি। তাই শঙ্কর যদি বাঁচে, তবে ওষুধে-পত্রে নয়, জপে-তপে নয়, বউমার ঐ সতী শক্তিতে।'

'আপনি আজ কোর্টে যাবেন?' উপস্থিত সকলে উঠে পড়তে পারলে যেন স্বস্তি পায়।

'বা, কোর্টে যাব বৈকি। আমরা আমাদের কাজ করে যাব। আইন বসে থাকবে না, আমরাও বসে থাকব না। এ কী, উঠছেন নাকি আপনারা?'

'হ্যাঁ, আজ উঠি। আপনার মন ভালো নেই।'

'আরে রাখুন। আইনের চোখে মন বলে কিছু নেই। শুধু শরীর। শরীরের ক্রিয়া। কী যেন বলেছে আপনাদের শাস্ত্র? শারীরং কেবলং কর্ম—' হেসে উঠলেন রাজেন্দ্রনাথ।

তবু নথিপত্র গুটিয়ে মক্কেলের দল পালিয়ে গেল। আরেক সময় আসব।

কোর্ট থেকে যথাবিধি বাড়ি ফিরে টেলিফোন করলেন রাজেন্দ্রনাথ। ওপার থেকে ধরল তৃপ্তি।

'খোকা কেমন আছে?'

'একই রকম।'

'সকাল বেলায় এক সন্ন্যেসী গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, উনিই তো সুন্দরানন্দ স্বামী, খুব পাওয়ারফুল সাধু, খুব নাম-ডাক।'

'করল কিছু?'

'শিয়রে বসে চোখ বুজে কতক্ষণ জপ করলেন দেখলাম।'

'ফল হল? চোখ চাইল খোকা?'

'দেখি না তো!' ব্যাথায় বুক ভেঙে যাচ্ছে তৃপ্তির। 'এখন পর্যন্ত তো চেতনার এতটুকুও রেখা দেখি না! তবে রাতের দিকে কী হয়, কিছু উন্নতি হয় কিনা ভগবান জানেন—'

'শোনো, হয়তো ডাক্তারিতেই ফল দিল রাতের দিকে, আর তারই সুবিধে নিয়ে বসল ঐ সন্ন্যেসী—'

'কে কী সুবিধে নিল, তা দিয়ে আমাদের কাজ কী। আমাদের রুগীর জ্ঞান হলেই আমরা খুশী। তবু মহাপুরুষ যে দয়াপরবশ হয়ে এসেছিলেন বাড়িতে, এটাই আমার কাছে খুব শুভলক্ষণ মনে হচ্ছে।'

'নিজের থেকে এসেছেন মনে কোরো না। নিশীথ ভটচাজ নিয়ে এসেছে অনেক খোসামোদ করে। হয়তো বা টাকা কবলে। সে ভাবছে, তাতে যদি তার প্র্যাকটিসের সুবিধে হয়। আর সাধু ভাবছে, তাতে যদি তার প্র্যাকটিসের।' রাজেন্দ্রনাথ একটু বা তিক্ততা আনলেন কণ্ঠস্বরে। 'কারু সর্বনাশ কারু পৌষ মাস।'

'আর সকলের দুধে চিনি হোক, তাতে আমাদের আপত্তি কী', তৃপ্তি বললে, 'আমাদের শাকে বালি না হলেই হল। আপনি একবার আসছেন?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।'

রাজেন্দ্রনাথ ছেলের বাড়ি গিয়ে পৌঁছুলেন।

ভিড়—ভিড়—এত ভিড় কেন বাড়িতে? আর কেন এত গোলমাল?

ও-ঘরে কী? তান্ত্রিক স্বস্ত্যয়ন করছে আর এ ঘরে? চণ্ডী পাঠ করছে পুজুরী।

'এ সব কেন?' ভীষণ বিরক্ত হলেন রাজেন্দ্রনাথ। 'এ সবে কী হবে?'

'যে যা বলছেন সব রকম করে দেখছি।' তৃপ্তি বললে, 'কোনো ত্রুটি কোনো খুঁত রাখতে চাচ্ছি না।'

'ডাক্তার—ডাক্তাররা কোথায় ?'

'তারা সব উপরে, রুগীর কাছে।'

রাজেন্দ্রনাথ উপরে উঠলেন। তাঁকে দেখে উৎসুক আগন্তুকের ভিড় সরে পড়তে লাগল।

'আমাদের সবতাতেই ভিড়, সবতাতেই গোলমাল।' বললেন রাজেন্দ্রনাথ। 'কিছুতেই সংক্ষেপ হবার জো নেই। সর্বত্রই বাহুল্য, সর্বত্রই বিস্তার। রুগীকে শান্তিতে মরতে দিতে পর্যন্ত আমরা প্রস্তুত নই। রুগীর ঘরে-বারান্দায় এত লোকের যে আমদানি হয়েছে তাতে রোগের সুরাহাটা কী হচ্ছে শুনি ?'

একজন কে বলে, 'আর নিচে যে ঐ কী পাঠ হচ্ছে শুনি ?'

'ন্যাইসেন্স !' রাজেন্দ্রনাথ গর্জন করে উঠলেন। 'পড়বি তো এক-আধ পৃষ্ঠা পড়, তা না, গোটা বইটা পড়ছে। মানে, পসার বাড়াবার চেষ্টা। সশব্দে বই পড়লে হবে কী ? যম মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনবে আর ভুলে যাবে রুগীকে ? এ কি জজ-ঠকানো উকিলের রুলিং পড়া ?' রুগীর খাটের কাছে চেয়ারে বসলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'তৃপ্তির ইচ্ছে।' কে আরেকজন বললে।

'হ্যাঁ, তৃপ্তির তৃপ্তি।' সায় দিলেন রাজেন্দ্রনাথ। 'ওর সর্বস্ব নিয়ে প্রশ্ন, তাই ওকে কিছু বলতে পারছি না। কিন্তু ও একটা অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের বশবর্তী হবে, হাঁচি টিকটিকি মানবে এ অসহ্য।'

ছোট একটা খুরিতে করে একটা জবাফুল নিয়ে কে ঢুকল।

'এ ফুল দিয়ে কী হবে ?' রূঢ়স্বরে জিজ্ঞেস করলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'এ বাবা চিত্তেশ্বরীর নির্মাল্য।' পিছন থেকে তৃপ্তি বললে, 'চিত্তেশ্বরী খুব জাগ্রত। এর প্রসাদী ফুলের তাই অনেক মূল্য।'

লোকটা সাহস পেয়ে ফুলটা রুগীর মাথায় ঠেকিয়ে বালিসের নিচে গুঁজে দিল।

ডাক্তার বসেছিল পাশে। তার দিকে ক্রূর দৃষ্টি ছুঁড়ে রাজেন্দ্রনাথ বললেন, 'এ সব আপনারা অ্যালাউ করছেন?'

'কেন করব না?' ডাক্তার হাসল। 'আমরাই কি জানি কী দিয়ে কী হয়!'

'তার মানে? বিজ্ঞানে আপনাদের বিশ্বাস নেই?'

'খানিক দূর পর্যন্ত আছে, তারপরে সব ঝাপসা, সব এলোমেলো।'

'তাই আপনারা, ডাক্তাররা, আপনারাও খোল-কত্তাল ধরেছেন?' ঝাঁজিয়ে উঠলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'উপায় নেই। দিব্যি আউট অফ ডেঞ্জার ডিক্লেয়ার করে এলাম, শুনলাম তার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই টেঁসে গিয়েছে—তেমনি আবার—'

'তার মানে কী হল?'

'মানে হল, বিজ্ঞানই শেষ নয়, বিজ্ঞানের বাইরেও আরো কিছু আছে।' ডাক্তার সবিনয়ে বললে।

'যদি কিছু থেকে থাকে তা অজ্ঞান।' ছেলের দিকে তাকালেন রাজেন্দ্রনাথ।

কিন্তু রাত নটা হতেই রুগীর অবস্থা ভালো হল। শঙ্কর চোখ চাইল। চিনতে পারল লোকজন। বললে, 'জল খাব।'

আনন্দের ঢেউ পড়ে গেল সংসারে।

বাড়িঘর আস্তে আস্তে জনশূন্য হয়ে এল, থেমে গেল মন্ত্রতন্ত্র, পাঠকীর্তন।

'তুমি এবার একটু ঘুমোও।' বাড়ি ফিরে যাবার আগে তৃপ্তিকে সস্নেহে বললেন রাজেন্দ্রনাথ।

বিষণ্ণরেখায় তৃপ্তি একটু হাসল, কথা কইল না। রাজেন্দ্রনাথকে এগিয়ে দিল গাড়ি পর্যন্ত।

ভোরবেলা টেলিফোন বাজল।

'কর্তাবাবু, মানে ব্যারিস্টার সাহেব কোথায়?'

'প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কোনো খবর আছে?'

'আছে। শঙ্করবাবু এইমাত্র মারা গেলেন।'

বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে শুনলেন রাজেন্দ্রনাথ। কাছাকাছি চেয়ারটাতে বসলেন। বসে পড়লেন না—ধীরে ধীরে বসলেন।

ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালেন। আজ শনিবার। কোর্ট নেই। বাতাসে স্বস্তির স্পর্শ পেলেন রাজেন্দ্রনাথ।

'কাল রাতে যখন ওবাড়ি থেকে চলে আসি, বউমার মুখের হাসিটা আমার ভালো লাগল না।' যেন কাউকে না লক্ষ্য করে নিজের মনেই বলছেন, 'শঙ্করের জ্ঞান হবার পর সকলে কেমন হালকা মনে আনন্দ করছে, কিন্তু তৃপ্তির হাসিটি বিষাদে মাখা। ও কি বুঝতে পেরেছিল এই আনন্দ টিকবে না!'

কিন্তু এখন একবার তৃপ্তিকে গিয়ে দেখ।

শঙ্করের মৃতদেহের উপর লুটিয়ে পড়ে সমুদ্রের মত কাঁদছে। আর কত কী বলে-কয়ে আকুলি-ব্যাকুলি করছে তার লেখাজোখা নেই।

স্তব্ধ হয়ে এক পাশে বসে আছেন রাজেন্দ্রনাথ।

তৃপ্তির শোক যতই গভীর হোক, অভ্রভেদী হোক, এই প্রকাশটি রাজেন্দ্রনাথের কাছে বাড়াবাড়ি লাগছে—অবৈজ্ঞানিক। মৃতদেহটাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে রাখবার কী হয়েছে? কতক্ষণ ধরে রাখতে পারবে? শ্মশানযাত্রীরা টেনে কেড়ে নিয়ে যাবে জোর করে?

স্বামী তাকে কত কী আদর সোহাগ করেছিল, কত কী আরো প্রতিশ্রুত ছিল, সেসব গোপন কথা জগজ্জনে প্রচার করাটাও নিরর্থক। সব স্বামীই এ রকম করে থাকে, বলে থাকে। এর মধ্যে কী এমন অভিনবত্ব শঙ্করের! কিসে শঙ্কর অনন্য?

শোক প্রকাশের রীতিতেও শালীনতার দরকার।

আহা, কাঁদতে দাও, ঢালতে দাও, নিঃশেষ হতে দাও। তোমার মত নির্মম, নিরশ্রু আর কজন!

ফুল—ফুল, ফুলই বা কত! আর কত বা ফটোগ্রাফারের ক্লিক-ক্লিক!

তৃপ্তি নিজের হাতে সাজিয়ে দিল স্বামীকে। বরবেশে সাজিয়ে দিল। সাজিয়ে দিয়ে উঠেই মাথা ঘুরে টলে পড়ে গেল মাটিতে। সবাই ভাবলে বরের সঙ্গে বধূবেশে সহমরণে যায় বুঝি।

না, সামলেছে তৃপ্তি। বলছে, 'আমি বেঁচে না থাকলে এ দহনজ্বালা বইবে কে ?'

'কিন্তু আপনার এতটুকু অস্থিরতা নেই।' সোমবার দিন কোর্টে এলে সবাই ঘিরে ধরল রাজেন্দ্রনাথকে, 'আশ্চর্য পুরুষ আপনি।'

'বৈজ্ঞানিক পুরুষ।' নির্লিপ্ত মুখে বললেন রাজেন্দ্রনাথ। 'অস্থির হয়ে উন্মত্ত শোক করলে কিছু সুফল হবে ? হয়েছে ? আমার বৌমা যে এত শোক করছেন, বিশ্বপ্লাবী শোক, তাতে তাঁর স্বামীকে ফিরে পেয়েছেন ?'

কত বারণ করেছিল সবাই, তবু পুরোপুরি থান পরেছে তৃপ্তি। হাতে গলায় সোনার এক সুতো স্মৃতিও রাখেনি। চুল ছেঁটে দিয়েছে। মেঝেতে খড় বিছিয়ে শুচ্ছে। চারদিকে দেয়ালে শঙ্করের নানা বয়সের নানা ভঙ্গির ছবি, নানা জাতের জিনিসপত্র। যেখানে চোখ পড়বে সেখানেই শঙ্কর দেখবে। শঙ্কর ছাড়া দিক নেই দেশ নেই দৃশ্য নেই।

রাজেন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে দেখেন তৃপ্তিকে, মনে মনে অভ্যর্থনা করেন, বলেন, একেই বলে সতীশক্তি।

ছেলেপিলে হয়নি, তৃপ্তিকেই শ্রাদ্ধ করতে হবে।

যত অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার। চালকলার পিণ্ড করে নাও-নাও খাও-খাও বললেই মরা লোকের ভূত এসে তা খেয়ে নেবে ? গাঁজার কলকে দিলে তাও ?

শ্রাদ্ধের বিরোধী রাজেন্দ্রনাথ।

আর যদি কিছু করতেই হয় নমো নমো করে সেরে দাও। কিন্তু তাতে তৃপ্তির আপত্তি। অশৌচের পর্বটাও দশ দিনে সংক্ষেপ করতে সে রাজি নয়, পুরো ত্রিশ দিন সেটাকে টেনে নিয়ে চলো। আর ত্রিশ দিন কি, বাকি জীবনটাই তো এখন মরণাশৌচ।

'বাবা, ওঁর ভারি ইচ্ছে ছিল আমাকে দিয়ে একটা নার্সারি খোলান—' বললে তৃপ্তি।

'হ্যাঁ, আমি জানি। নইলে তুমি বাকি জীবন থাকবে কী নিয়ে? সতীশক্তি এবার মাতৃশক্তি হবে।' রাজেন্দ্রনাথ কি অবৈজ্ঞানিক হচ্ছেন? পরমুহূর্তেই বাস্তব স্বরে বললেন, 'তোমার নামে আমি বাড়ি কিনে নেব। কথাবার্তা আজ সকালেই হয়ে গেছে। দিন সাতেকের মধ্যেই রেজিস্ট্রি করে দেবে আশা করি।'

'ওঁর নামে ইস্কুলটার নাম হবে।'

'ওর নামের কী দরকার? তোমার নামের মধ্যে দিয়েই ও বেঁচে থাকবে। তাই নার্সারির নাম হবে তৃপ্তি। এমনিতেই একটা তুষ্টিবাচক-নাম।'

অনেক দিন পর তৃপ্তি একটু হাসল।

পরদিন বুধবার বললে, 'বাবা, ওঁর লাইফ ইনসিয়োরের টাকা—'

'খোঁজ নিয়ে দেখলাম মোটে চল্লিশ হাজার। আমি নিজের থেকে আরো ষাট হাজার দিয়ে এক লাখ পুরিয়ে তোমার নামে ব্যাঙ্কে রেখে দেব। ভালো হবে না?'

'হবে।' সামান্য ঘাড় হেলাল তৃপ্তি। আর এবারের হাসি ঠোঁট ছাপিয়ে গালে লুটিয়ে পড়ল।

'ইস্কুল নিয়ে, বাবা, আমাকে অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে।' এ বললে বৃহস্পতিবার।

'তা তো করতেই হবে।' রাজেন্দ্রনাথ বললেন, 'তাই ভাবছি ছোট গাড়িটা তোমাকে ট্র্যান্সফার করে দেব।'

হাসি আজ তৃপ্তির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। বললে, 'আমি ড্রাইভিং শিখে নেব।'

'কী দরকার! ড্রাইভারের মাইনে আমি দেব।'

ভালোবাসায় ভোলালেন রাজেন্দ্রনাথ। বাড়ি দিলেন গাড়ি দিলেন নগদ টাকা দিলেন ষাট হাজার।

সমস্ত কায়-কারবার চুড়ান্ত করে নিতে তিন সপ্তাহ লাগল।

তারপর আটাশ দিনের দিন, শ্রাদ্ধের দু'দিন আগে রাজেন্দ্রনাথের কাছে ডাকে এক চিঠি এল।

বাবা,

আপনি মহানুভব। আমি দিনকয়েকের মধ্যে বিয়ে করছি। আপনি আমাকে মার্জনা করবেন। শ্রাদ্ধটা আর কাউকে দিয়ে করিয়ে নেবেন দয়া করে। ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিন। ইতি।

তৃপ্তি

চিঠিটা বার কতক পড়লেন রাজেন্দ্রনাথ। অন্যমনস্কের মত এটা-ওটা কটা আইনের বই ঘাঁটলেন। পরে টেবিলের উপর মাথা গুঁজে দিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন ছেলের জন্যে।

'দাঁড়াও, দিচ্ছি।'

ব্যাগ খুলে পয়সা দিতে হলে দুটো হাতকেই মুক্ত হতে হয়। এক হাতে রড ধরে ঝুললে আরেক হাতে ব্যাগ খোলা যায় না।

'দাঁড়াও, দিচ্ছি, পালাব না।' কেদারনাথ বললে।

তারই মধ্যে কেউ-কেউ দিচ্ছে যারা দাঁড়িয়ে চলেছে। গায়ে-গায়ে এত ভিড়, দুহাত ছেড়ে দিলেও টলে পড়ছে না। চার দিক থেকে ছেঁকে-ধরা মানুষই আশ্রয় দিচ্ছে, দিচ্ছে না পড়তে। এই নাও ভাড়া। তালপুকুর ক পয়সা? গাবতলা?

কেদারনাথ ভাড়া দিল এমনি মনে হল লক্ষ্মীর। ভাড়া দেওয়া হয়ে গেলে বাকি রাস্তা আর ব্যাগের খোঁজ পড়বে না নিশ্চয়ই। আর, পড়লেই বা কী!

লেডিজ সিটে জানলার ধারে লক্ষ্মী বসেছিল। ডান দিকের জায়গাটা খালি। ভীষণ লোভ হলেও কোন পুরুষের সাহস হচ্ছে না, বসে। অধিকার না থাক, অনুমতি নিয়ে যে বসবে সেটুকু সপ্রতিভও কেউ নেই ভিড়ের মধ্যে।

এত লোক যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখানে একটা জায়গা খালি যাবে এ যেন লক্ষ্মীরই অসহ্য লাগছিল। বুড়ো ভদ্রলোক একবার রড ধরছেন, আরেকবার সিটের পিঠটা ধরছেন, কিছুতেই সোয়াস্তি পাচ্ছেন না। ধুঁকছেন, কাশছেন, ঠোক্কর খাচ্ছেন।

'আপনি বসুন না।' বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে স্পষ্ট তাকাল লক্ষ্মী।

'আমাকে বলছ?' যেন এক নজরে বিশ্বাস করতে পারছে না কেদারনাথ।

'হ্যাঁ, আপনি বুড়ো মানুষ, আপনার বসতে আপত্তি কী।' আরো একটু শীর্ণ হল লক্ষ্মী।

'বেঁচে থাকো মা, বেঁচে থাকো।' কেদারনাথ পা ছড়িয়ে বসল। 'শ্রান্তকে আসন দেওয়া পুণ্য কাজ।'

লক্ষ্মী ছোট্ট একটি কটাক্ষ ছুঁড়ল। মনিব্যাগের একটা কোণ পকেটের বেড়া টপকে মুখ উঁচিয়ে আছে।

পারবে কি আলগোছে ওটা তুলে নিতে?

পারবে না। কিছুতেই পারবে না। কোনোদিন আগে নিয়েছে যে সাহস হবে? কেউ তাকে শিখিয়েছে তুলে নেবার কায়দা?

বসবার আরাম পেয়ে চোখ বুজেছে কেদারনাথ। ঢুলতে স্থরু করেছে। ঝিমুনির মুখে দু-একবার লক্ষ্মীর গায়েই ঢলে পড়েছে। তড়পে-তড়পে উঠেছে বুড়ো। আবার ঢুলেছে। আবার চলেছে।

নিজের মনেই মৃদু মৃদু হাসছে লক্ষ্মী। বিরক্ত হচ্ছে না। নিদ্রালুকে উপাধান দেওয়া বোধ হয় আরো পুণ্য।

সামনের সিটের পিঠটা দুহাতে আঁকড়ে ধরে মাথা গুঁজে বসেছে এবার কেদারনাথ। ওভাবে বসার দরুন জামার বুক-পকেটটা ফুলে উঠেছে, ভিতরের ব্যাগটা আরো একটু ঝুলে পড়েছে। যেন নিজের থেকেই বলছে, আমাকে তুলে নাও।

নিশ্চয়ই বেশি কিছু নেই ওটার মধ্যে, তাই বুড়ো এত অসতর্ক হতে পেরেছে। নইলে এমন খ্যাপার মতন কেউ ঘুমোয়? ঘুমোবার মন হয়?

বেশি কিছু নেই—তারই বা মানে কী? যদি দু-চার আনাও থাকে তাও বা লোকসান হবে কেন? একটা পয়সা পথে পড়ে গেলে তাও খুঁজে কুড়িয়ে নিতে হয়। কেউ কিছু অমনি দিয়ে দিতে আসে না। তা ছাড়া ব্যাগ—ব্যাগটও তো বয়ে যেতে আসেনি। তারও কিছু দাম আছে।

আচ্ছা, যদি টেনে নিতে পারে ব্যাগটা, সটকান দিতে পারে, তারপর বাড়ি গিয়ে দেখে, কিস্সু তেমন নেই, কটা শুধু খুচরো, তাহলে, ছি ছি,

কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। কিন্তু, ভাগ্য যদি দয়া করে, যদি ব্যাগটা বেশ শাঁসালো হয়, তাহলে, তাহলে কী করবে? আকাশ দিয়ে একটা উড়ো জাহাজ চলে গেল বুঝি। লক্ষ্মীও তেমনি চোখের পলকে উড়ে পালাবে। কোথায়? জায়গার নামটা এখুনি জানতে চেয়ো না। লক্ষ্মীই কি জানে!

আহা, কত সে ব্যাগ নিয়ে সরে পড়তে পারছে! সোজা অমনি চুরি করে পালানো? উনি মেয়ে বলে ওঁকে কম সন্দেহ করবে! আজকাল অত খাতির নেই। চোরের কাছ থেকে নিজের জিনিস উদ্ধার করবার বেলায় আবার বলাৎকার কী! কিছুতে ছাড়বে না। কেউ ছাড়ে না। ঠিক ছিঁড়ে-ফেড়ে নেবে।

এ সব ব্যাপারে সেথো দরকার। দিব্যি টুক করে তার হাতে চালান করে দিত ব্যাগটা। সে দিত আবার আরেক হাতে। আর যদি সোরগোল উঠত, তা হলে যার হাতে ব্যাগটা নেই সেই ছুট দিত অকারণে আর যার হাতে ব্যাগ সে প্রাণপণে চেঁচাতো, ঐ চোর! ঐ চোর! একটা তালগোল-পাকানো ভোজবাজি হয়ে যেত!

লক্ষ্মী সেথো কোথায় পাবে? জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। ভেবেছিল, শুধু রাস্তাটাই বুঝি চোখে পড়বে। কিন্তু, না, তার চেয়ে অনেক বেশি দেখে ফেলল এক সঙ্গে। শুধু রাস্তা নয়, রাস্তার ধারে গাছ, গাছের ওধারে খেত, মাঠ, নদী, আকাশ, মেঘ—অনেক, অনেক বেশি। না, তার সাথি কৈ?

এই যে সে একা-একা যাচ্ছে বাসএ, একি তার নিজের ইচ্ছেয় নয়? দেখাচ্ছে নিজের ইচ্ছেয় বটে, কিন্তু যেহেতু তার বয়েস এখনো আঠারো পেরোয়নি, আর যেহেতু সে এখনো বাপের আশ্রয়ে আছে, তার ইচ্ছের পিছে-পিছে চলেছে তার বাপের কর্তৃত্ব, বাপের রক্ষণাবেক্ষণ। কিছুতেই তার নিস্তার নেই। আঠারো ডিঙোতে পারলেই সে শিকল-ছুট! সকল-ছুট। তখন তার এই যাওয়াটা নিজের যাওয়া হত, অভিভাবকের চোখের ছায়ায়-ছায়ায় যাওয়া হত না। এখন যত-দূরই যাই না কেন,

গাঁ ছেড়ে কলকাতা, আর কলকাতা ছাড়িয়ে দিল্লি, সেই চোখ সঙ্গে-সঙ্গে ফিরবে।

তার আঠারো বছর পূরতে আর ক'দিন বাকি ?

সরকারী উকিল হেরম্ব মিত্তির জিগগেস করল লক্ষ্মীকে, 'তোমাকে তো গৌর বলেছিল ওর সঙ্গে চলে যেতে। আর তুমি তারই জন্যে বেরিয়েছ বাড়ি থেকে।'

কারু দিকে তাকাল না লক্ষ্মী। না উকিলের দিকে, না বা মুখোমুখি চেয়ে-থাকা বাপের দিকে, না বা আসামীর দিকে। দৃঢ়স্বরে বললে, 'না, আমি নিজের ইচ্ছেয় বেরিয়েছি।'

বাপ বিরূপাক্ষ হৈ-হৈ করে উঠল। হেরম্বর জুনিয়র বললে, 'হোস্টাইল ডিক্লেয়ার করুন।'

'রাখো, অত চঞ্চল হলে চলে না।' হেরম্ব তর্জন করে উঠল। 'ওর বয়েস যদি আঠারোর কম হয়, ও যদি নাবালিকা হয়, তা হলে ওর আবার নিজের ইচ্ছে কী ! বয়েসের কথায় পরে আসছি। যতক্ষণ ও নাবালিকা ততক্ষণ ধরে নিতে হবে, ওর বাপ যখন বেঁচে, ও ওর বাপের অধীনে আছে। দেখি না, কী বলে, ও ওর এই অধীনতা কোনোদিন ছিন্ন করেছে কি না, ত্যাগ করেছে কিনা বাপের আশ্রয়। ওয়েট য়্যাণ্ড সি।'

সাক্ষীর দিকে, মানে লক্ষ্মীর দিকে, এক পা এগুলো হেরম্ব। 'তুমি যে বাড়ি ছাড়লে তখন রাত কটা হবে ?'

মিথ্যে বলবে না লক্ষ্মী। বললে, 'নটা-দশটা।'

'যখন তুমি বেরোলে তখন দোরগোড়ায় বা কাছেপিঠে কেউ ছিল না, তুমি একাই বেরুলে ?'

'হ্যাঁ, একা। নিজের ইচ্ছেয়।'

'বেশ। তারপর নিজের ইচ্ছেয় কদ্দুর পর্যন্ত গেলে ?'

'ফকিরতলা, খেয়াঘাট।'

'সেখানে গৌরের সঙ্গে দেখা হল ?'

'হ্যাঁ—'

'গৌর বলেছিল সেইখানে সে থাকবে।'

চকিতে কাঠগড়ায় আসামীর সঙ্গে চোখাচোখি হল লক্ষ্মীর। বললে, 'না, আমিই তাকে থাকতে বলেছিলাম।'

'তা বলো। মানে তুজনে ঠিক ছিল ওখান থেকে নৌকো করে পালাবে।'

'হ্যাঁ, আর কোনো দিন ফিরব না।'

'নৌকো ভাড়া করল কে?'

'গৌর। তা চিরকাল পুরুষেই করে।'

'নৌকো চিনিয়ে নিয়ে তোমাকে কে তুললে?'

'যে ভাড়া করেছে সে ছাড়া কার নৌকো কে চেনে?'

'আর, এই দেখ, এসব চিঠি গৌরের লেখা?'

'তাতে কী হল?'

'কিছু হয়নি। জিজ্ঞেস করছি। তোমাকেই তো লিখেছে চিঠিগুলো।'

'আর কাকে লিখবে?'

'আর এসব চিঠিতে আছে, তোমাকে সে দূরে নিয়ে যেতে চাইছে।'

'আর কিছু নেই?'

'না তা তো আছেই, তা তো থাকবেই। কিন্তু ও প্রস্তাবও আছে?'

'কিন্তু আমি যদি যেতে না চাই, আমাকে নেয় কে জোর করে?'

'তা তো ঠিকই।' হেরম্ব বসে পড়ল। জুনিয়রকে বললে, 'আমাদের এতেই হবে। এ কেস নয় যে মেলা দেখতে এসে মেয়ে পথ হারিয়েছিল আর গৌর তাকে তুলেছিল নৌকোয়। কিংবা এও নয় যে বাপের বাড়ির আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে বাইরে চলে আসার পর মেয়ে সামিল হয়েছে গৌরের সঙ্গে। এরা পুরোনো পাপী।'

'আমরা তু'জনে এক দোষ করলুম, দিদি', মামলা-চলতি কালে বড় বোন কমলার কাছে বসে কেঁদেছে লক্ষ্মী, 'অথচ আসামীর কাঠগড়ায় শুধু একা গৌর দাঁড়িয়ে। আমি কেন ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম না?'

'তোকে দাঁড়াতে দিলে তো!'

'কেন দিলে না? ও তো আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়নি, বরং আমিই ওকে ভুলিয়েছি। তবু সাজা দেবার বেলায় শুধু ওকে দেবে? আমাকে দেবে না? এ কেমন দুরন্ত আইন!' বলেছে আর কেঁদেছে লক্ষ্মী। 'উচিত ছিল কাঠগড়ায় আমাদের দু'জনকে পাশাপাশি দাঁড় করানো। একসঙ্গে জেলে পাঠানো। দারোগাবাবু বলেছিলেন, তা যদি হতো, জেলখানাতেই আমাদের বিয়ে দিয়ে দিতেন।'

'তুই তো বোকামি করলি।' কমলা গলা নামিয়ে বললে, 'তোর উচিত ছিল ঝগড়া-ঝাটি করে এ বাড়ির ভাত খাই না বলে ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার বাড়ি পালিয়ে আসা। সৎ মা না অসৎ মা—দোরগোড়ায় লাথি মেরে ছুটে বেরিয়ে পড়া। তারপর গৌরকে খবর দেওয়া। দু'চার দিন পর গৌর এসে তোকে নিয়ে যেত আমার বাড়ি থেকে, দেখতিস, কোনো অপরাধ হত না।'

'হত না?' দিদির দু'হাত আঁকড়ে ধরল লক্ষ্মী।

'না, কী করে হবে? তখন তোর অভিভাবক বাবার হেপাজত থেকে তো নিয়ে যাচ্ছে না, নিয়ে যাচ্ছে তোর দিদির বাড়ি থেকে, যে বাড়িতে তুই বাপের আশ্রয় ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছিস। তাহলে তোদের নৌকো দিব্যি তরতর করে বয়ে যেত। কেউ ধরতে পারত না।'

'আমরা অজ্ঞান, অধম—আমরা সরল, কারসাজি কারচুপির ধার ধারলুম না, তারই জন্যে আমরা ভুগলুম! বাঁ দিক দিয়ে ঘুরিয়ে খেলে দোষ নয়, ডান দিক দিয়ে ঘুরিয়ে খেলে দোষ, দিদি, এ কোন বিধি?'

লক্ষ্মীর খোলা চুলে হাত বুলুতে বুলুতে কমলা বললে, 'তুই ছেলেমানুষ, তুই এ সব বুঝবি না।'

'ছেলেমানুষ!' ঝঙ্কার দিয়ে উঠল লক্ষ্মী। 'কবে ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছি। সেই কবে বাবা ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন বড় হয়েছি বলে। ছেলেমানুষ হয়ে কী আমি না জানি! আর আমি বেশি জানি

বলেই তো আমার এই দশা। বাবা আমাকে অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে পারছেন। ভাবতে পারছেন বিয়ের কথা।'

'সব জানাজানি হয়ে গিয়েছে। কে আর তোকে বিয়ে করবে?' মামলা শেষ হয়ে যাবার পর আরেক দিন বলেছিল কমলা। 'তোর গৌর জেল থেকে বেরিয়ে এসেই তোকে বিয়ে করবে। তত দিনে তুই পেরিয়ে যাবি আঠারো।'

'কত আঠারো পেরিয়ে গেছি মনে-মনে।'

'তাতে কী আর হবে? হাড়ে-মাংসেও পেরিয়ে যাওয়া চাই।' কমলা শুধোল। 'কদ্দিন জেল হয়েছে রে গৌরের?'

'ছ মাস।'

'মোটে?' আশ্বাসের সুরে বললে কমলা, 'এ দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।'

'কই কাটছে কই? দু জনের যদি এক সঙ্গে সাজা হত তা হলে বরং কাটত তাড়াতাড়ি। দু জনেই এক সঙ্গে আগুনে হাত দিলুম, ওর হাত পুড়ল আমার পুড়ল না, এ কেমন আগুন?'

'তুই যে ছেলেমানুষ।'

বয়সের কথাটাই উঠেছিল প্রধান হয়ে।

দেখতে তো বেশ ঢ্যাঙা, ছন্দে-বন্ধে বেশ জোরদার। নির্ঘাৎ আঠারোর বেশি। রব তুলেছিল আসামীর উকিল।

উপর উপর দেখলে কি চলবে? আর উপর-উপর দেখতে যদি চান, মুখখানি দেখুন, বললে হেরম্ব। মুখখানি কী কচি!

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভেংচি কাটল লক্ষ্মী।

'তাতে কি আর বয়স বাড়বে?' জজ সাহেব স্বয়ং চিপটেন কাটলেন।

'অত কথায় কাজ কী। ডাক্তারি রিপোর্ট দেখুন। ঘটনার দিন লক্ষ্মীর বয়স বড় জোর সতেরো বছর দুই মাস। কিছুতেই তার একদিন বেশি নয়। আজ মামলার শুনানির দিন ওর কত বয়স সেটা দেখতে হবে না। দেখতে হবে ঘটনার দিন, ওকে যখন গৌর বার করে নিয়ে

যায় তখন ওর বয়েস কত? তখন ওর বয়স আঠারোর কম ছিল কি না। একদিন কম হলেও অপরাধ হয়ে যাবে। এখানে দেখা যাচ্ছে অন্তত দশ মাস কম ছিল।'

মামলার পর লক্ষ্মী তার সই শৈলকে বলেছিল, 'শোন একবার কলঙ্কের কথা। দশ মাস পরে বেরুলে যা অপরাধ হত না, দশ মাস আগে হল বলেই তা অপরাধ।'

'তেমন হলে কটা মাস অন্তত তো হাঁসপাতালেই কাটাতে পারতিস।' প্রতিবেশিনী সখী শৈল পর্যন্ত তার দিকে।

'কত কিছুই করতে পারতাম।' লক্ষ্মী কান্নাঝরা গলায় বললে, 'এ ভদ্রলোকের মত বেরুনো কি না, তাই যত শত্রুতা। কোনো ভালোই কেউ দেখতে চায় না, আজকাল। তাই সকল ভালোর শ্রেষ্ঠ ভালো যে ভালোবাসা তাই সকলের হু' চক্ষের বিষ। তোকে কী বলব। তুই তো সব বুঝিস। হ্যাঁ, আমি বেরুতুম না বাড়ি থেকে। ঐ দশ মাস বাড়িতেই থাকতুম। কিন্তু থাকতুম বিতিকিচ্ছি হয়ে। ভূত হয়ে, কিম্ভুত হয়ে। তখন দেখতুম কী করে গৌরের জেল হত। অন্য যার তার নাম বলে দিতুম, কিংবা বলতুমই না কিছু। যদি গৌরের সঙ্গে বিয়ে দাও তো গৌরের নাম বলি। বুঝলি শৈল, ভদ্রলোক থাকলুম কিনা, পরিষ্কার থাকলুম কিনা, তাই লোকের চোখ টাটাল—'

'ডাক্তারি পরাক্ষা অদদূর পর্যন্ত গিয়েছিল নাকি?' মাথার কাপড়টা ঘন করে টেনে শৈল জিগগেস করল গাঢ় হয়ে।

'শেষ পর্যন্ত গিয়েছিল। সুযোগ পেলে ডাক্তার কখনো ছেড়ে দেয় নাকি? পুলিশ চেয়েছিল অপরাধের মাত্রাটা বাড়ানো যায় কিনা। কিন্তু তন্ন তন্ন পরীক্ষার পরও ডাক্তার কিছু পেল না। তখন শুধু ভালোবাসাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাল।'

'প্রায় এক রাত নৌকোয় কাটালি দুজনে, অথচ—' শৈল আরো এগিয়ে এল।

'গৌর যে খুব ভালো। বললে, যদি কিছু অন্যায় করি নদীতে, দেখবে,

ঠিক ধরা পড়ে যাব। দেখবে এই মাঝি দুটো যেমন চোখে চাইছে ওরাই ধরিয়ে দেবে। তুমি তো লক্ষ্মী, তুমি শুধু লক্ষ্মীটি হয়ে ঘুমোও, আমি সারারাত তোমাকে দেখব আর পাহারা দেব। দেখবে আমরা শান্তিতে থাকব, সব শান্তি হবে। কেউ আসবে না ধরতে। ঠিক চলে যেতে পারব কলকাতায়। আর কলকাতায় পৌঁছুতে পারলে আর আমাদের পায় কে।'

'কিন্তু শান্তিতে থাকলেও তো সেই ধরলই—'

'শান্তকেই তো ধরবে। দুর্বল আর নিরীহকে ধরাই তো বাহাদুরি। শেষ রাত্রের দিকে দু দুটো পুলিশের নৌকো ঘিরল আমাদের। জানিস, তখনো আমি ঘুমে। গোলেমালে আমি জেগে উঠতে চাইছি, আর গৌর আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাইছে। বলছে, ও কিছু নয়, ও কিছু নয়, তুমি ঘুমোও—যতক্ষণ আমি জেগে, আমি বেঁচে, ততক্ষণ তোমার ভয় কী—' কেঁদে ভেঙে পড়ছে লক্ষ্মী।

হেরম্ব বললে, 'বয়সের আরো প্রমাণ আছে, স্কুলে ভর্তি হবার সময় কী লিখিয়েছিল তার বাবা—'

'ও আবার একটা প্রমাণ।' বললে আসামী পক্ষ।

'অকাট্য নয় হয়তো। কিন্তু ও যদি উলটোটা দেখাত, যদি দেখাত ঐ হিসেবে আঠারোর বেশি হয়, তা হলে একটা সন্দেহ হত নিশ্চয়ই। আর যুক্তিযুক্ত সন্দেহ আনতে পারলেই তো আসামীর পোয়াবারো। কিন্তু ঐ স্কুলের হিসেবেও ঘটনার দিন লক্ষ্মীর বয়স সতেরো বছরের বেশি হয় না।'

'কী ছাই পড়তে গিয়েছিলি স্কুলে!' শৈল আরো দুঃখ করেছিল। 'মাঝপথে বাবা অকারণে নিয়ে এল ছাড়িয়ে।'

'বাবা ঠিক নয়, ঐ অসৎ-মা। উনি কাজ করবেন আর আমি দিন-মান ইস্কুলে কাটাব এ সহ্য হল না। তবু ভাগ্যিস একটু লিখতে-পড়তে শিখেছিলাম। তাই তো ভাই চিঠি লেখালেখি করতে পারলাম। কথা কইবার চেয়েও এ আরেক রকম সুখ, চিঠি লেখা, চিঠি পাওয়া। যে কথা কয় তার থেকে এ যেন এক আলাদা লোক যে লেখে। সেই লেখার লোকটি ভাই কী সুন্দর! সে যেন আরেক লক্ষ্মী, আরেক গৌর!'

স্বয়ং জজ পর্যন্ত বললে, 'বাক্যে বানানে ভুল কিন্তু, যাই বলুন, চিঠিগুলিতে বেশ একটা সারল্যের সৌরভ আছে।'

তদন্তকারী দারোগা মন্মথ পালেরও সেই মত। বিরূপাক্ষকে বললে, 'কেন, ঝামেলা করছ, গৌরের সঙ্গেই মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দাও। যাঁহা বাহান্ন তাঁহাই তিপান্ন। যাঁহা সাড়ে সতেরো তাঁহাই আঠারো।'

লক্ষ্মীকে বললে ঠাট্টা করে, 'যদি ষড়যন্ত্রী বলে আইনে শাস্তি দেওয়ার বিধান থাকত, তা হলে জেলরকে বলে জেলের মধ্যেই তোমাদের বিয়েটা ঘটিয়ে দিতাম।'

কিন্তু বিরূপাক্ষ ছাড়ে না।

জুরি ছাড়ে না।

জজ ছাড়েন কী করে? কিন্তু শাস্তি দেবার বেলায় জেল দিলেন মোটে ছ মাস। বললেন, 'আজ এই মামলার নিষ্পত্তির দিন লক্ষ্মীর বয়স সতেরো বছর সাত মাস। গৌর যখন বেরিয়ে আসবে জেল থেকে, তখন যেন দেখে লক্ষ্মী স্বাধীন হয়েছে, সাবালক হয়েছে। সেটা শুধু গৌরের নয়, যেন সেটা লক্ষ্মীরও কারামোচনের দিন হয়।'

'মানে,' মন্মথ বুঝিয়ে দিলে, 'জেল থেকে বেরিয়েই যেন গৌরহরি বিয়ে করতে পারে লক্ষ্মীকে।'

'বিয়ে করাচ্ছি।' বললে বিরূপাক্ষ। 'ছ মাস পেরোবার আগেই লক্ষ্মীর বিয়ে সে ঠিক করে ফেলেছে। ট্রাঙ্কের কারখানায় মিস্ত্রির কাজ করে, পাশালি গ্রামে থাকে অনিল দাস, সেই বিরূপাক্ষর মনোনীত।'

সেই বিয়ে খণ্ডাবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে লক্ষ্মী।

সে তো গোপন কোন অভিসারে যাচ্ছে না যে তার আঠারো বছর পোরাতে হবে। সে আজ একা চলেছে। তাকে আজ কে ধরে? সে চলেছে জেলের দিকে। তার গৌরের দিকে। চোরের আবার অভিভাবক কী?

একটা সাইকেলকে বাঁচাতে গিয়ে বাসটা সবেগে ডাইনে বাঁক নিল, সঙ্গে-সঙ্গে ব্রেক।

ফলে বাসের মধ্যে হুলুস্থুল।

কতক্ষণ পরেই কেদারনাথের আর্তনাদ : 'আমার ব্যাগ ? মনি-ব্যাগ ?'

হৈ-চৈ পড়ে গেল চারদিকে। কাউকে নামতে দেবেন না। সব সার্চ করব আমি। আমরা সার্চ করব। কতগুলি ছোকরা কোমর বাঁধল একজোট হয়ে।

'নিচেটাই ভালো করে খুঁজুন, ছিটকে কোন সিটের তলায় চলে গিয়েছে হয়ত।' কে একজন নিরীহ ইঙ্গিত করল।

'মোটেই সিটের তলায় নয়।' কোণ থেকে কে একজন এগিয়ে এল। 'আমি জানি কে নিয়েছে ব্যাগ। সব দেখেছি আমি স্বচক্ষে।'

'কে ? কে ?' সমস্ত বাস লাফ দিয়ে উঠল।

'ঐ যে, উনি।' দেখিয়ে দিল লক্ষ্মীকে। 'ব্যাগ সিটের তলায় নয়, ওঁর জামার তলায়।'

'বার করে দিন ব্যাগ।' ছোকরার দল সতেজে দাবি করল।

ঠায় বসে রইল লক্ষ্মী।

ভাবতে লাগল, এর চেয়ে সেই নৌকোয় ধরা পড়াটা কী মনোহর ছিল।

'আপনি ওর জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেখুন—'

বাসের যাত্রিনী এক মহিলাকে আদেশ করল সোয়ারিরা।

যথাদিষ্ট হাত ঢোকালেন মহিলা। বেরুল মনিব্যাগ।

তা হলে আর কথা কী। সমস্ত বাস নিয়ে চলো থানায়। থানা বেশি দূরে নয় বলেই বলছি। নইলে মেয়ে-পকেটমারকে সশরীরে নিয়ে যাই কী করে! মেয়ে-পুলিশ আর এখানে কোথায়!

বাসকে দাবি মানতে হল। চোর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাক্ষীদের নামিয়ে দিল থানায়।

থানায় সেকেণ্ড অফিসর সেই মন্মথ দাসই এখনো আছে।

ছন্নছাড়ার মত চেহারা, লক্ষ্মীকে চিনতে পারল এক নজরে।

'এ কি, তুমি! তুমি পকেট মেরেছ!'

'আর কী!' ঝকঝকে দাঁতে দিব্যি হাসল লক্ষ্মী, 'এবার তবে জেলে

পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা ভুল করবেন না যেন। ষড়যন্ত্রী হয়ে তো যেতে পারলাম না, তাই এবার শুধু যন্ত্রী হয়ে এসেছি। যেখানে গৌর সেখানেই তো লক্ষ্মী।'

সবাই অবাক মানল। 'এ কি দাগি নাকি?'

মন্মথ নিশ্বাস ফেলে বললে, 'নিদারুণ।'

পুলিশ চার্জসিট দিলে না।

কেদারনাথই চাইল না অগ্রসর হতে। দেখুন মেয়েটা বোকা, আনাড়ি। ও অনায়াসে ব্যাগটা ফেলে দিতে পারত। হাত দিয়ে তুলে না হোক ত পলকে জামার বাঁধনটা আলগা করে গলিয়ে দিয়ে। তারপরে অনায়াসে দাবি করতে পারত ওটা ওর গা থেকে পড়েনি যার ব্যাগ তার পকেট থেকেই পড়েছে। এখন ওকে শাস্তি দেওয়া মানে ওর বোকামির জন্যে শাস্তি দেওয়া। সেটা মোটেই সমীচীন নয়। তাছাড়া ব্যাগ যখন আস্ত পাওয়া গিয়েছে তখন আবার হাঙ্গামা কী! তাছাড়া যেটা সব চেয়ে বড় কথা, এই কদিন বাদে ওর বিয়ে হচ্ছে।

'হ্যাঁ' মন্মথ বললে, 'ওর একটা বিয়ে আমরা হতে দিইনি। এটাও ভণ্ডুল করে দেব, এটা ঠিক নয়।'

'ও বোকার মত ইচ্ছে করে ধরা দিল বলেই আমরাও বোকার মত ইচ্ছে করেই ওর জীবনের লাল দিনটা কালো করে দেব, ধর্ম বলবে কী।'

ফাইন্যাল রিপোর্ট দিল পুলিশ। ম্যাজিস্ট্রেট ছেড়ে দিল লক্ষ্মীকে।

যাতে আর কিছু গোলমাল না হয়, পুলিশ পাহারা মোতায়েন রাখলে। অনিলের সঙ্গে লক্ষ্মীর বিয়ে হয়ে গেল।

'একটা পকেটমারকে বিয়ে করতে তোমার লজ্জা করলনা?' গর্জে উঠল লক্ষ্মী।

'তুমি তো পকেট মারোনি।' অনিল বললে হাসতে হাসতে।

'মারিনি? কিন্তু একটা লোকের সঙ্গে কুলের বার হয়ে গিয়েছিলাম তা জানো না?'

'নাবালকের আবার কুল কি।' অনিল আরও প্রশস্ত হল।

'নাবালক! তুমি পরে বুঝবে। দেখবে আমার মধ্যে কোন সার নেই, পদার্থ নেই।'

'ডাক্তারি পরীক্ষায় তো তুমি ফুলমার্ক পেয়েছ।'

'না, না, তুমি জানো না, কিচ্ছু জানো না। বলো, তুমি আমাকে এ কোথায় নিয়ে এলে! পুলিশ আমাকে এ কোথায় পাঠাল!'

অনিল স্নিগ্ধ মুখে বললে, 'তুমি জেলখানায় যেতে চেয়েছিলে না, এখানটা হয়তো সেই জেলখানা। কিন্তু তোমাকে বলছি যেদিন তোমার মুক্তির পরোয়ানা নিয়ে দোরগোড়ায় হাজির হবে গৌরহরি, সেদিনই তোমাকে ছেড়ে দেব।'

'ছেড়ে দেবে?' অনিলের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল লক্ষ্মী।

'হ্যাঁ, আজকাল বিয়ে ছেড়ে দেওয়া সহজ হয়েছে। যে জেলখানায় যেতে চেয়েছিলে তার চেয়ে এ জেলখানা সোজা। ঐ জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন কিন্তু এ জেলখানা থেকে, কাল যদি গৌর এসে তোমাকে চায়, কালই তুমি খালাস হয়ে যাবে।'

'যদি পর্শু আসে?' অনিলের দুহাত চেপে ধরল লক্ষ্মী।

'পর্শু।'

'যদি তার পরের দিন আসে?'

'তার পরের দিন।'

লক্ষ্মী কান পেতে রইল। ঐ বুঝি শোনা যাচ্ছে গৌরের পায়ের শব্দ। তার নিশ্বাসের আভাস।

'যদি আরো একদিন দেরি হয়?'

'তাহলে আরো একদিন পরে।'

'যদি আর না আসে!'

অনিল খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। পরে বললে, 'তা হলে আমিই সেই গৌরহরি।

ভক্তদের কাছে বলছেন মা, হিরণ্ময়ের চিঠি এসেছে।

সবাই হকচকিয়ে উঠল। কী লিখেছে?

'ফিরে আসছে শিগগির।' বললেন মা।

'কবে আসছে?'

'তা কিছু লেখেনি।' মা চোখ বুজলেন। পরে নিজের থেকেই বললেন, 'তুএক দিনের মধ্যেই এসে পড়বে। আহা, আসুক।'

আশ্রমে যারা নতুন তারা কেউ-কেউ জিগগেস করল, কে হিরণ্ময়?

পুরনো জাস্তা ভক্তদের একজন বললে, 'মার সন্তান।'

সন্তান তো মার সকলেই। এখানে-ওখানে, দেশে-বিদেশে—অগণন মার সন্তান। কিন্তু হিরণ্ময় কি একটু আলাদা রকম নয়? নইলে, আহা, আসুক এ সুরটুকুর মানে কী? একটু বিশেষ মমতা কি শোনা যাচ্ছে না?

হ্যাঁ, যাচ্ছে। শোনো তবে সেই অন্তরঙ্গ কাহিনী।

মনশ্চাঞ্চল্য ঘটেছিল হিরণ্ময়ের। মার কাছে এসে কেঁদে পড়ল। বললে, 'মা অনুমতি করুন, এ দেহ ছেড়ে দিই।'

'সে কী কথা?' মা শিউরে উঠলেন। 'কেন, কী হয়েছে?'

হিরণ্ময় কী বললে মার কানে কানে।

মা মৃদু হাসলেন। বললেন, 'আমি সব জানি। কিন্তু এতে এত বিচলিত হবার কী হয়েছে?' পরে উদারস্নেহে তার মাথায় হাত রাখলেন: 'কলিতে মনের পাপ পাপ নয়।'

'কিন্তু মা, মন এই দেহের বাসাতেই বন্দী। অণুবীক্ষণে ধরা পড়ে না এমন যে কীট, মন তার থেকেও সূক্ষ্ম। কিছুতেই চিকিৎসা নিয়ে

পৌঁছুতে পাচ্ছি না তার কাছে।' ধিক্কারে শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে হিরণ্ময়। 'যখন এই ব্যাধির কিছুতেই নিরসন নেই তখন এ দেহ নষ্ট করে দিই। দেহের উৎখাতেই মনের উৎখাত।'

মার মুখে বরাভয়ের হাসিটি লেগেই আছে। বললেন, 'ঈশ্বর সম্ভোগ করবার জন্যেই তো দেহ। দেহই যদি উড়িয়ে দাও তাহলে আর রইল কী?'

'কিন্তু মন? মনকে উৎপাটন করব কী করে?'

'উৎপাটন করা যায় না। বশীভূত করা যায়।'

'অসম্ভব। সেই মত্ত করীকে কিছুতেই বাঁধতে পারছি না, মা।'

'তবে এক কাজ করো বাবা, এই লোকালয় ছেড়ে চলে যাও।'

'কোথায় যাব? নির্জনেও এই মন। এই ব্যাধি। এই ক্লেশ।'

'ব্যাধি যখন, তখন উপশমও আছে। তুমি হিমালয়ের প্রান্তে আমার গুরুদেবের কাছে চলে যাও। সেইখানেই উপায় খুঁজে পাবে।'

'ঠিকানা?'

মা লিখে দিলেন ঠিকানা।

একটানা ছ বছর সেই গুরুর আশ্রমে কাটিয়েছে হিরণ্ময়। অখণ্ড কঠোরের মধ্যে। সাত বছর পরে গুরু ছুটি দিয়েছেন। ফিরে আসছে মার কাছে।

'আমরা ভেবেছিলাম আর বুঝি ফিরবে না।' টিপ্পনী কাটল কেউ-কেউ: 'হিমালয়েই থেকে যাবে।'

'সে কী?' মা অসন্তুষ্ট হলেন। 'এখানে এখনো ওর কত কাজ!' পরে তাকালেন কণার দিকে। বললেন, 'আরেকখানা ভজন ধরো মা—'

উঠতে যাচ্ছিল, মার হুকুমে আবার পা গুটিয়ে বসল কণা। গান ধরল চোখ বুজে।

শান্তি নেমে এল সংসারে। স্নেহে নত হল আকাশ। গাছ-লতা ঘাস-মাটি সর্বাঙ্গে পুলক ধারণ করে রইল। খরস্পর্শ বাতাস সুখস্পর্শ

হয়ে উঠল। যদি কোথাও বিক্ষোভ বা বিক্ষেপ থেকে থাকে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

গান শেষ করে উঠে দাঁড়াল কণা। গায়ের চাদরটা বিস্তৃত করে পরিপাটি করল গায়ে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, 'গোপাল কেমন আছে?'

মিষ্টি করে হাসল কণা। বললে, 'ভালো আছে মা।'

আর ট্রেন নেই। এবার বাস।

আর বাসও নেই।

শেষ বাস-স্টপের লোক হদিস দিতে পারলনা এ গ্রাম কতদূরে। কিন্তু মা যা পথের নিশানা দিয়েছেন তাতে বাস-স্টপের পর প্রথম গাঁ-টা মিলে গেল। ব্যস, তা হলেই হবে। হাঁটা দাও। ঠিক পথেই এসেছে। তারপর দ্বিতীয় গাঁটাও মিলল। আরো হাঁটো। পথ ক্রমশই পরিষ্কার হবে।

আর নামা নয় শুধু ওঠা। শুধু পেরিয়ে আসা।

'কদ্দূর যাচ্ছেন?' পথের সঙ্গী, এক সন্ন্যাসী, জিজ্ঞেস করল হিরণ্ময়কে।

গুরুর নাম বলল হিরণ্ময়। তাঁর আশ্রমে।

অত কোমল করে বলছেন কেন? বলুন, গুহায়। অন্ধকারকে বন্দী করে রাখা পাথরের কারাগারে।

'ভালোই তো। কোমল ছেড়ে এসেছি, কঠোরের সাক্ষাৎ পাব বলে।'

'যান, পাবেন।'

'পাব?' হিরণ্ময় তাকাল অদ্ভুত চোখে: 'কী পাব?'

'যা চাইছেন, যা সকলে চায়, তাই।'

'সকলে কী চায়?' বিশাল চোখে তাকিয়ে রইল হিরণ্ময়।

'আর কি চায়!' সংক্ষিপ্ত হতে চাইল সঙ্গী। বললে, 'আনন্দ! নিত্যানন্দ!'

'কিন্তু আমি তো আনন্দ চাই না'—হিরণ্ময় বললে।

'আনন্দ চান না? তা হলে কী চান?'

'আমি চাই শান্তি, উপশম।' হিরণ্ময়ের মুখে বেদনার ছায়া পড়ল: 'আমি সদর্থক কিছু চাই না, আমি নঙর্থককে চাই। আমি স্বাস্থ্য চাই না, আমি চাই আরোগ্য। নির্বাণ বোঝো? আমি চাই তেমনি নিভে যেতে—'

'হ্যাঁ, তাই, তাই দিতে পারবেন বাবা। খুব তেজী সাধু—এদিকে অনেক আগে থেকে আছেন—' সন্ন্যাসী বললে সর্বজ্ঞের মত।

'তারই জন্যে তো এসেছি।'

সন্ধ্যা পার হয়ে গেলে সাধুবাবা ডাক দিল হিরণ্ময়কে।

প্রণাম করতে দিল না। দূরে বসতে বলল।

'কথাটা কী?'

'মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'তা তো দেখছি। কিন্তু ও নিজে পারলনা—এমন কী হতে পারে?' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সাধু।

আরো হীন, অপরাধী বলে মনে হল নিজেকে। হিরণ্ময় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল। যেন মাকেও সে ম্লান করে দিয়েছে।

'হয়েছে কী?' হোমকুণ্ড নিভে গিয়েছে কিন্তু সাধুই জ্বলন্ত কুণ্ড। দুই চোখে স্থির স্ফুলিঙ্গ নিয়ে হুঙ্কার করে উঠল সাধু: 'হয়েছে কী?'

চোখ নত করে চুপ করে রইল হিরণ্ময়।

'চুপ করে থাকলে চলবে কেন? কথা কও। এখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। নিঃসঙ্কোচে সব কথা বলা যায় গুরুকে। গুরুর গুরুকে।'

'নিশ্চয়। গুরুই তো ওঙ্কারমূর্তি। বুদ্ধিকে শুদ্ধ করতে গুরুবাক্যের মত শক্তিধর আর কী আছে।' গাঢ়স্বরে বললে হিরণ্ময়, 'বুদ্ধির পারে যে পরতত্ত্ব তার উপলব্ধির উপায়ও গুরুবাক্য।'

'কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্‌।' সাধুবাবা বললে, 'তা হলে আর চিন্তা কি। বলো কী হয়েছে?'

হিরণ্ময় ভেবেছিল সাধু বুঝি নিজের থেকেই বুঝতে পারবে তার গহনমনের অব্যক্তকে। কিন্তু, না, এ এক জটিল কুণ্ডলী। এর মোচন নেই, সরলীকরণ নেই। এ বেদনা নিরুচ্চার।

'যন্ত্রণাটা কী?' হুঙ্কার করল সাধু।

'কাম।'

কথাটা বলতে কুণ্ঠা বোধ করেছে হিরণ্ময়, স্পষ্ট লক্ষ্য করল সাধু। বললে, 'কাম যন্ত্রণা হবে কেন? কাম তো আনন্দ।'

'আনন্দ!' হিরণ্ময়ের উদ্ভাসিত মুখে দুই চোখ জ্বল-জ্বল করে উঠল।

'দেহ ধরেছ যখন তখন কাম তো থাকবেই। কাম না থাকলে তো ঈশ্বর-কামনাও থাকবে না।' সাধু নিশ্চিন্ত শান্তিতে বললে, 'কামকে প্রেম করো। অঙ্গারকে হীরে। মধু-কৈটভ নিধন হল কিন্তু তাদের মেদ দিয়ে রচিত হল মেদিনী। সুতরাং রূপান্তর ঘটাও।'

'সেইটেই পাচ্ছি না।' কান্নাঝরা কণ্ঠে বলে উঠল হিরণ্ময়। 'পাপপুরুষকে কিছুতেই পাচ্ছি না পরাস্ত করতে। শত নিগ্রহেও দৃঢ় হচ্ছে না মন।'

'কেন, উৎপাতটা কী হচ্ছে?'

'যখনই ধ্যানে বসেছি তখনই কণাকে দেখছি।'

'কে কণা?'

আর লজ্জিত হল না হিরণ্ময়। বললে, 'আমার জীবনের এক দুষ্পূর তৃষ্ণা। করালী অথচ সুহাসিনী।'

'সব কথা খুলে বলো।'

কাহিনী খুব সরল। এক পাড়ায় পাশাপাশি বাড়িতে থাকত হিরণ্ময় আর কণা। বাড়িতে যখন পাশাপাশি তখন হৃদয়েও তাই হওয়া দরকার, হিরণ্ময় ভালোবাসল কণাকে, ওর ভাষায়, ওর চিদ্‌গগনচন্দ্রিকাকে। শুধু আকাশতত্ত্বের ভালোবাসা নয়, ক্ষিতিতত্ত্বের ভালোবাসা—চাইল বিয়ে করতে। প্রত্যাখ্যান করে দিল কণা। কোনো সূক্ষ্ম কারণে নয়, স্থূল কারণে। কণা বিয়ে করবে না। ব্রহ্মচারিণী হবে। সে

কোনো পার্থিব পুরুষকে চায় না, সে চায় পুরুষোত্তমকে, যিনি ক্ষরের অতীত, অক্ষরের চেয়েও উত্তম।

ছেলেবেলা থেকেই অন্তরের দিকে অভিমুখী কণা। সমবয়সিনীরা যখন পুতুল খেলেছে তখন ও খেলেছে ঠাকুর-ঠাকুর। ওরা চেঁচিয়ে পড়া মুখস্ত করেছে আর কণা গান গেয়েছে পদাবলী। গানে-গানে জ্যোতিষ্মতী হয়ে উঠেছে। স্বররসমাধুরীতে বিলোচ্ছে নামরসমত্ততা। প্রগাঢ় ভক্তিতে আরূঢ় সে রূপ দেখবার মত। সে রূপ দেখে কাঁদবার মত।

'কিন্তু সে রূপ শুদ্ধ নয়।' বলে উঠল সাধু।

'নয়?'

'যদি শুদ্ধই হবে তবে তাকে দেখে কাম জাগবে কেন? জাগবে চমৎকারিত্ব।' সাধু মেরুদণ্ড খাড়া করে বসল: 'জাগবে নিশ্চিন্ত বিশ্রান্তি।'

'তাতে, মহারাজ, তার দোষ কী?' আকুলস্বরে বললে হিরণ্ময়, 'দোষ আমার। আমার পাপচক্ষুর। পাপ মনের।'

সাধুজী বললে, 'তার পর?'

আভাসে-ইঙ্গিতে আরো অনেকবার সংসার-অভিলাষ ব্যক্ত করেছে হিরণ্ময়। বারে বারেই মুখ ফিরিয়েছে কণা। বলেছে আমি বাসর-ঘরের নই, আমি ঠাকুরঘরের। মাতাজীর কাছে দীক্ষা নিয়েছে। ছেড়েছে সাজসজ্জা, ছেড়েছে স্বভাবরুচি। চলে এসেছে ধূসর ঔদাস্যে। উন্মনা বনবাসিনীর মত বাস করছে সংসারে। রসে-ছন্দে সমৃদ্ধ সে আরেক মহাকাব্য।

'তুমি কী করলে?'

'চাকরি করছিলাম, ছেড়ে দিলাম। যা কিছু সঞ্চয় করেছিলাম দিয়ে দিলাম মাতাজীর আশ্রমে। মাতাজীর পায়ে শরণ নিলাম। দীক্ষা নিলাম।'

'থাকলে কোথায়?'

'আশ্রমেই আশ্রয় পেলাম।'

'আর ও? কণা?'

'ও গৃহেই থাকল। ও গৃহে থেকেও বৈরাগিনী আর আমি বাইরে থেকেও তৃষ্ণাতুর। বিরজা স্নান করে নিল ও, আর আমি যে ধূলোতে শুয়েছিলাম সে ধূলোতেই শুয়ে রইলাম।'

'কিছুতেই তাড়াতে পারছিলে না ওকে?'

'কিছুতেই না। যতদিন সংসারে ছিলাম, মাঝে মাঝে তবু ভুলে থাকতে পারতাম, মাঝে মাঝে তবু ভ্রান্তি-মুক্তি ঘটত, কিন্তু এখন এ কোন এক অব্যয় ধামে এসে উঠলাম যেখানে ক্ষণকালের জন্যেও কণাটুকুও হারায় না। একটিমাত্র কণাই অখণ্ড হয়ে সমস্ত আকাশ-পৃথিবী পরিব্যপ্ত করে রাখে। সত্তার সমস্ত স্তরেই কণার আনন্দ-জাগরণ।'

'দেখা হত না?' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগগেস করছে সাধুজী।

'হত। যখনই উৎসব হত আশ্রমে মা ডেকে পাঠাতেন গান গাইতে। তা ছাড়া সভায়-সমিতিতে যেখানেই ওর গান হত আমি যেতাম, যতদূর সাধ্য ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে বসে থাকতাম। ওকে শোনাই ওকে দেখা। হরজটাজালের মধ্যে সুরশৈবলিনী জেগে উঠছে এমনি মনে হত। কিন্তু আমার দিকে ও ফিরেও তাকাত না।'

'চোখে চোখ পড়লেও না?'

'চোখে চোখ পড়লেও না। কেন তাকাবে?' হিরণ্ময়ের কণ্ঠ কান্নার মত ঝরে পড়তে লাগল: 'আমার মুখে সে স্বর্গের শান্তি কই? কই সেই অমৃত জ্যোতি? সত্যের গভীর সারল্য? আমার দৃষ্টিতে কামভুজঙ্গ ফণা তুলে আছে, সে দংশন সে নেবে কেন? তাই মধ্যরাত্রে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম, আমার মুখমণ্ডলকে সুন্দর করো, উজ্জ্বল করো, নিষ্কলুষ করো। ওর ক্লান্ত বিরক্ত চোখের দৃষ্টি যেন ও একবার রাখে আমার মুখের উপর। যেন ক্ষণকালের জন্যে হলেও ও পলক না ফিরিয়ে নিতে পারে। যেন বুঝতে পারে কী ভীষণ ভালোবেসেছি

ওকে। একটা বীজের মধ্যে শুনতে পারে এক বনস্পতির কান্না, পারহীন একটা স্পৃহার আকৃতি—'

'কথা হয়নি আর?'

'হয়েছিল—আমার দীক্ষা নেবার কয়েক বছর বাদে—এই সেদিন—'

'কী কথা হল?' কিছুতেই ছাড়বে না সাধুজী।

'ভক্ত পুরুষ বা মেয়ের কোনো স্খলন-পতন দেখলে মা তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন, পাঠিয়ে দেন সংসারে। সেবার তেমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেই বিয়ের উৎসবে নির্জনে এক মুহূর্তের জন্যে ধরতে পেরেছিলাম কণাকে। বললাম, বহু দিন তপস্যা করলাম দুজনে, এবার মাকে গিয়ে বলি তিনি আমাদের মুক্ত করে গৃহনিকেতনে পাঠিয়ে দিন। ধিক্কার দিয়ে উঠল কণা। বললে, আমার মধ্যে স্খলন-পতন কোথায় যে সংসারে গিয়ে ঢুকব? পথ ছাড়ুন বলছি।'

'তুমি পথ ছেড়ে দিলে?'

'দিলাম। তার সে ধিক্কার প্রচণ্ড প্রহারের মত সর্বদেহ জর্জর করে তুলল। মনে দুটো অহঙ্কার ছিল। এক, আমি আর কামচঞ্চল হই না। আর, নিত্যধ্যানে আমার মুখে এমন এক দৃঢ় দীপ্তি জেগেছে যে ওই কামচঞ্চল হবে, আমাকে পারবে না ফেরাতে। এত দিনের প্রত্যাখ্যানের প্রায়শ্চিত্ত করবে। দুই পায়ে আমার দুই অহঙ্কার স্বচ্ছন্দে ও চূর্ণ করে দিল। আমার এক গালে চুন আরেক গালে কালি দিল মাখিয়ে—'

'তার পর?'

'তারপর মাকে গিয়ে বললাম, মা, এই পাপ দেহ আর রাখব না। আমার ঐশী লালসা নেই, আমায় শুধু পেশী-লালসা, তাই এই পঙ্কিল পাশব দেহ নষ্ট করে ফেলব। মা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আপনার কাছে।'

'ঠিক করেছেন। আর ওর কী হল? কণার?'

'কণাকে মা একটি গোপালের বিগ্রহ দিলেন, ও তারই সেবাচর্যা করছে—'

'গোপাল! যে সম্বেগকে বক্ষে-কক্ষে ধরল না সে গোপাল ভজবে কি করে?' সাধুজী চঞ্চল হয়ে উঠল: 'ওর বিগ্রহ ছিল রসরাজময় শ্রীকৃষ্ণ। বেণুবাদন-বিশারদ। যাগগে, ওর কথা ওর মা ভাবুক। এখন বলো, তুমি কী চাও?'

'দুটো জিনিস চাই।' হিরণ্ময় এগিয়ে এল সামনে। 'এক চাই কণাকে ভুলে যাব। ভুলে যাব মানে ওর প্রতি আর কামাতুর হব না। ওর স্মৃতি আর পারবে না যন্ত্রণা দিতে। যে পশুপাশে বন্দী হয়ে আছি তা খড়্গচ্ছিন্ন করে দেবেন।'

'আর?'

'আর, এটি আমার অন্তরঙ্গ অভিলাষ!'

'বলো কী?'

'সকল ব্যাথার প্রদীপ জ্বেলে আমি ওর আরতি করেছিলাম, কী দুর্বার ভালোবেসেছিলাম ওকে, ও যেন একবার বোঝে। আমি ওকে পাইনি সে আমার দুঃখ নয়, কিন্তু আমি যে ওকে বোঝাতে পারিনি আমার ভালোবাসা কত তীব্র আর স্বচ্ছ ছিল, কত সত্য আর পরিপূর্ণ, সেই আমার দুঃখ।'

'দুঃখ থাকবে না। তোমার দুই প্রার্থনাই পূর্ণ হবে।'

'হবে?' হিরণ্ময়ের স্বরে বুঝি সন্দেহের ছায়া পড়ল। দুটো আকাঙ্ক্ষা পরস্পর-বিরোধী নয়? কণা যদি বোঝেই তবে সেটা কি হিরণ্ময়েরও বোঝানো হয় না?'

'কাল সকালে এস। নতুন আসন শেখাব। নতুন ধ্যানের কৌশল। নিরালায় এবারই জপের অভ্যুদয় ঘটবে। জাগবে কুণ্ডলী শক্তি।'

'জাগবে!' বিশ্বাসে নত হয়ে প্রণাম করল হিরণ্ময়।

ছ বছরের অবিচ্ছিন্ন কৃচ্ছ্রের পর হিরণ্ময়কে মুক্তি দিল সাধুজী।

'কাম আর আছে '

'কাম নাম হয়েছে

'আর নাম?'

'নাম নাদ হয়েছে।'

'আর নাদ?'

'নাদ হয়ে উঠেছে আনন্দবাহিনী পরমপাবনী ত্রিবেণী।' বললে হিরণ্ময়।

'যাও, তাহলে আর ভয় নেই। যার বিশ্বাস মহানামকে আশ্রয় করেছে সে ক্রূর কালভয়কেও অতিক্রম করেছে। তারই ব্রাহ্মী স্থিতি। বিপুল গভীর প্রদীপ্ত মৌনরসেই সে নিত্যমগ্ন। সেই তার আত্মায় রমণ, তার প্রত্যয়শুদ্ধি।'

ধূলোয় সমস্ত দেহ লুটিয়ে সাধুজীকে প্রণাম করল হিরণ্ময়।

ফিরল মায়ের আশ্রমে। যে দেখল সেই অবাক হয়ে গেল। কঠোর করে করে কাঠ হয়ে গিয়েছে শরীর, কিন্তু মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। একটি পরম স্বস্তি পরম প্রাপ্তি যেন সেখানে বাস করছে। ক্ষয়হীন চ্যুতিহীন প্রশান্তি। ভস্মের মাঝেই যে অঙ্গারের শেষ হবার কথা, অদ্ভুত আন্তর রসায়নে তা স্বতঃসমুজ্জ্বল হীরে হয়ে উঠেছে।

মাতাজী বললেন, 'পরম নিরঞ্জনী জ্যোতি দেখছি তোমার মুখে। সাগর সেঁচে তুমি মাণিক আহরণ করে এনেছ। তোমার মুখে ফুটেছে তারই অনিন্দ্য অমল কান্তি। এবার একবার ডাকি কণাকে?'

হিরণ্ময় চুপ করে রইল।

মা ডেকেছে শুনে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এল কণা।

'গান শোনা, মা; কত দিন তোর গান শুনিনি।' মা কণার আনত মাথার উপরে হাত রাখলেন।

প্রণামের ভঙ্গি ছেড়ে আধখানা উঠে বসল কণা। হাঁটু দুমড়ে সেই খাড়া হয়ে বসার ভঙ্গিটি কী অপূর্ব! 'আজ কি কোনো উৎসব, মা?' কণা জিগগেস করল।

'সন্তান হিরণ্ময় হিমালয় থেকে ফিরেছে নিরাপদে। তার জন্যেই আজ বিশেষ পূজাপাঠ। আর তোর গান। ব্রহ্মচারীর বন্দনা।'

মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল কণা। কে হিরণ্ময়, কোথায় হিরণ্ময়, এতটুকুও কৌতূহল জাগল না। কাছাকাছিই বসে ছিল হিরণ্ময়, একবার তার মুখের উপর চোখ ফেলল না। অসতর্কে যদি বা একবার চোখ পড়ল তক্ষুনি ফিরিয়ে নিল। যে মুখলাবণ্যে সকলে চমৎকৃত, তা এতটুকুও মোহ আনতে পারল না তার মধ্যে। কত শান্তি কত নিবৃত্তি কত সংশুদ্ধি লিখে নিয়ে এসেছে সে মুখে, আর সমস্ত কণা দেখবে বলে, তা বুঝি নিরর্থক হল। দীর্ঘ এত দিনের সাধনায়ও বুঝি কোনো ফলই লাভ করতে পারেনি হিরণ্ময়।

চোখ বুজে গান ধরল কণা।

কী ভরপুর সুন্দর হয়ে উঠেছে। সঙ্গীত যেন শুধু তার কণ্ঠে নয়, শরীরের সমস্ত ঘনবিন্যস্ত লাবণ্যে, ভরা কোটালের জোয়ারে। অণু-অণু করে রেণু-রেণু করে দেখতে লাগল হিরণ্ময়, নিজের দেহের সমস্ত তন্তুতে শুনতে লাগল মন্ত্রঝঙ্কার—কামগায়ত্রীর মন্ত্র। স্মরদহনদগ্ধ হৃদয়ে আবার জাগল আস্পৃহা, আকুল আকূতি। কালীয়কে পারেনি দমন করতে। শতকৃচ্ছ্রেও সে পরাস্ত হয়নি, নিস্তেজ হয়নি। কিছুতেই বুঝি হয় না। আবার সে বিষ ঢেলেছে। 'বিষোঽপি অমৃতায়তে।' কোথায় সে অমৃত? কোথায় শান্তি কামকামীর?

মামুলি দুখানা গান গেয়ে চলে গেল কণা। যাকে নিয়ে উৎসব তার সন্ধানও করল না।

কী সুন্দর অহঙ্কার! কী সুন্দর উপেক্ষা। প্রতিজ্ঞায় সুন্দর, প্রত্যাখ্যানে সুন্দর। কোনো কঠোরের দরকার হয়নি, ছাড়তে হয়নি ঘর, যেতে হয়নি হিমালয়, তবু কত সহজে নিজেকে দৃঢ় করতে পেরেছে, অনন্যডাক অনন্যলক্ষ্য করতে পেরেছে। কণাই ধন্য, কণাই সিদ্ধ। আর সে—হিরণ্ময়? সে পশু, সে পঙ্গু, সে নিষ্কিঞ্চন। তার পরিত্রাণ নেই কিছুতেই।

তবে যে সাধুজী বলেছিল তার দুই আকাঙ্ক্ষাই চরিতার্থ হবে, তার কী হল? এক আকাঙ্ক্ষা, কণাকে ভুলব; আরেক আকাঙ্ক্ষা, কণাকে

জানাব। এই বুঝি সেই ভোলার চেহারা? আর এমন সৌম্য শান্ত প্রদীপ্ত মুখ দেখেও যদি সে মুগ্ধ না হয় তাহলে আর সে কী করে জানবে, কী করে বুঝবে?

যন্ত্রণায় ছিন্ন-ভিন্ন হতে লাগল হিরণ্ময়, কিন্তু শত চেষ্টায়ও ছিন্ন হবে না বুঝি পশুপাশ।

'কণা দেবী আছেন?' কণাদের কলকাতার বাড়িতে সদরে কড়া নাড়ল হিরণ্ময়।

কণার ছোট বোন দরজা খুলে দিল। 'আছেন। কী চাই বলুন?'

'আমাদের আশ্রমের উৎসবে ওকে গান গাইবার জন্যে বায়না করতে চাই। কত উনি নেবেন এবং নির্ধারিত দিনে ওঁর সুবিধে হবে কিনা জানতে এসেছি।' বললে হিরণ্ময়।

এমনি অনেকেই আসে। আর এই আগন্তুকের কেমন সাধু-সাধু বিশ্বাসী চেহারা। ছোট বোন সিঁড়ি দেখিয়ে দিল। বললে, 'উঠে যান উপরে। উঠেই ডানহাতি ঘর দিদির।'

সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে এলেও সিঁড়ি গুনতে দেরি করল না হিরণ্ময়। কয়েক লাফেই পার হয়ে গেল সিঁড়ি। পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল সবেগে।

'কে?' কণা আর্তনাদ করে উঠল।

'আমি।' কোন আদিম গুহা তার শূন্যতাকে উপহার দিল শব্দ রূপে। হাতের কাছেই সুইচ ছিল, আলো জ্বালাল কণা।

সাপ বা বাঘ দেখলেও এত বুঝি ভয় পেত না। নিজের ঘরের মধ্যে সামান্য একটা পুরুষে তার কী ভয়, কিন্তু এ পুরুষের চেয়ে বেশি, এ সন্ন্যাসী, এর চোখে-মুখে ব্রহ্মচর্যের আভা, এর দেহে তপস্যার তাপ— এর সান্নিধ্যের দাহ সে সহ্য করবে কী করে?

'এ কি, আপনি?' দু পা পিছিয়ে গেল কণা। চুল বাঁধছিল, দুই হাত মুক্ত করে শক্ত করে দাঁড়াল।

মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল হিরণ্ময়।

'কী চাই আপনার ?'

'আমি শুধু একবার তোমাকে জানাতে চাই, তোমাকে আমি কী নিদারুণ ভালবাসি। তার অর্থ, তোমার জন্যে আমার কী প্রবল তৃষ্ণা, কী আকণ্ঠ পিপাসা!'

'দূরে থাকুন, এগুবেন না এক পা।'

'না এগুলে কী করে ধরব তোমাকে? যে নাগপাশে আমি বাঁধা পড়েছি, কী করে দেব তোমাকে সেই বন্ধনযন্ত্রণা! সেই যন্ত্রণার স্পর্শ না পেলে কী করে বুঝবে আমার প্রেম?' মৃত্যুর মত এগুতে লাগল হিরণ্ময়।

'খবরদার—' কণ্ঠে যেন ভাষা নেই কণার। যেন কোন অপ্রতিরোধ্য তাকে বিধ্বস্ত করতে এসেছে। বাঘের মুখে গরুর মতই বুঝি সে নিঃঝুম। চোখ বোজা।

'মনের পাপ পাপ নয়—এতে আমার সান্ত্বনা নেই।' হিরণ্ময় আরো কাছে এল। 'সেই প্রচ্ছন্ন পাপকে দেহে আনতে চাই, অন্তত এক নিমেষের আলিঙ্গনে। কণা, তুমি একবার বোঝো, তুমি একবার জ্বলো, তুমি একবার রক্তাক্ত হও--'

ব্যাকুল বাহুর মধ্যে কণাকে নিবিড় করে গ্রহণ করল হিরণ্ময়।

দুর্দমের কাছে বশীভূত হতে হবে এমনি বুঝি ভেবে রেখেছিল কণা। কিন্তু কী অমানুষী শক্তি এল তার বাহুতে, চকিতে হিরণ্ময়কে সে ঠেলে দূরে ফেলে দিল ছুঁড়ে।

একটুও ব্যথা লাগেনি ধূলো লাগেনি এমনি তৃপ্তিতে হাসতে লাগল হিরণ্ময়। আবার উদ্যত হলনা আক্রমণে, ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। বললে, 'তোমার প্রত্যাখান নতুন নয়, এ আমার সহ্য হয়ে গিয়েছে। তোমাকে যে আজ জানাতে পেরেছি তোমাকে কী অতলান্ত ভালবাসি, তোমার কাছে আমার কী সুদূর আকাঙ্ক্ষা তাতেই আমি সিদ্ধ, চরিতার্থ। এবার আমার এই কামক্লিষ্ট দেহকে—যে কাম শত কৃচ্ছেও পারিনি উন্মূল করতে—অনায়াসে নষ্ট করে দেব। পরিচ্ছন্ন বিবেকে পারব নষ্ট করতে।'

দেখল, মেঝের উপর বসে পড়ে দু হাঁটুতে দু বাহু রেখে তাতে মুখ গুঁজে কাঁদছে কণা।

ফিরলনা, শুনলনা, বুঝলনা হিরণ্ময়।

মায়ের কাছে কণা গেল এর প্রতিকার চাইতে।

মা সব শুনলেন। বললেন, 'তুমি এবার তবে পুরোপুরি সংসারী হও। বিয়ে করো।

'কাকে? ঐ পতিত সন্ন্যাসীকে? হিরণ্ময়কে?'

'না, আমি তোমাকে বর বেছে দিচ্ছি। তোমার উপযুক্ত পাত্র।'

ফিলমে গান দেয় এমনি এক ভক্ত নির্বাচিত করলেন মাতাজী। তার সঙ্গে কণার বিয়ে হয়ে গেল—মার আদেশ শিষ্যদের লঙ্ঘন করবার জো নেই। আশীর্বাদ করে দিলেন মা, 'দুজনেই যথেষ্ট রোজগার করতে পারবে। তুমি গান লিখে আর তুমি তা গেয়ে—প্লেব্যাকে। একটা কীর্তনের স্কুল খুলো, ঢের ছাত্রী পাবে। আর সভায়-সমিতিতে বায়না পাবে এন্তার—'

গোপালের বিগ্রহ ফেরৎ দিতে এল কণা।

মা বললেন, 'এবারই তো গোপালসেবার ঠিক-ঠিক মন্ত্র পাবে, মা!'

চোখে-চোখে এতদিন রেখেছিলেন মা, কণার বিয়ে হতেই ছেড়ে দিলেন হিরণ্ময়কে।

নির্জন মধ্যরাত্রে শয্যাপাশে কে এসে বসেছে। হিরণ্ময় তাকিয়ে দেখল, সাধুজী।

'কি, তোর দুই প্রার্থনা পূর্ণ হল কিনা?'

'পূর্ণ হল?'

'হলনা? প্রকটে তাকে জানাতে পারলি তোর অন্তরের কামনা, আর, দ্বিতীয়ত, তাকে পারলি তাড়িয়ে দিতে। তাড়িয়ে দিতে পারা মানেই বিসর্জন দেওয়া বিস্মৃতিতে। এবার তুই মুক্ত, তোর দুই গ্রন্থিই খসে গিয়েছে জীবন থেকে। চল, উঠে দাঁড়া—'

'কিন্তু আমি পতিত সন্ন্যাসী।'

'পতিত সন্ন্যাসীই তো উত্থিত সন্ন্যাসী। যে না পড়ে তার ওঠায় দাম কী? নে, ওঠ। যে পড়েও না ওঠেও না, শুধু নড়ে-চড়ে, সমুদ্রের গভীরে যে নামে না শুধু তীরে-তীরে ঘুরে বেড়ায়, তুই তাদের দলে নোস। একমাত্র তোরই তো পবিত্র হবার প্রতিশ্রুতি। নে, ওঠ, হাঁটতে শুরু কর। তোর মায়ের মত আছে—আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি। চল, চল হিমালয়।'

অন্ধকার থাকতেই উঠে পড়ল হিরণ্ময়।

আজ মা-মণি আসবে! আজ মা-মণি আসবে! কী মজা, আসবে আজ মা-মণি। সকাল থেকেই মন্তু হল্লা শুরু করে দিয়েছে।

'মোটেই আজ আসবে না।' জেঠতুত ভাই পিন্টু খেপাতে এল।

'আসবে না! তুমি বললেই হবে?'

'কী করে আসবে? আজ কি রবিবার?'

'ও মা, কী বোকা! আজ রবিবার নয় তো আমি ইস্কুল যাচ্ছি না কেন? বাবা কেন এখনো খবরের কাগজ পড়ছে? জেঠু কেন এখনো দাড়ি কামাতে বসেনি?' ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল মন্তু।

'কেউ আপিস-ইস্কুল যাচ্ছে না বলেই আজ রবিবার হল?' পিন্টুও চলে এল বারান্দায়।

'তবে কি আজ শুক্কুরবার?' মন্তু ঝাঁজিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, শুক্কুরবারই তো। ক্যালেণ্ডার ছাখ না।' হাত ধরে ঘরের দিকে টানল তাকে পিন্টু।

মন্তু ক্যালেণ্ডারের কী বোঝে! তবু ফের এল ঘরের মধ্যে। পিন্টু দু বছরের বড়, অনেক সে বেশি জানে, তাই তাকে সমীহ করতে হয়। কিন্তু আজকের বার সম্বন্ধে কী সে প্রমাণ দেয় একবার দেখা ভালো।

ক্যালেণ্ডারে একটা লাল তারিখের উপর সরাসরি আঙুল রেখে ভারিক্কি চালে পিন্টু বললে, 'কী এটা শুক্কুরবার তো? আর দেখছিস, এটা লাল। তার মানে কী?'

ড্যাবডেবে চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল মন্তু। কী মানে, তা সে কী জানে? তার মা-মণি এলে পারত বুঝিয়ে দিতে।

'তার মানে', পিণ্টু বললে, 'আজকে শুক্কুরবারটা ছুটি। লালটা যে ছুটির চিহ্ন তা জানিস তো? ছুটির দিন হলেই সেটা রবিবার হবে এমন কোনো কথা নেই। অন্যবার, শুক্কুরবারও ছুটি হতে পারে। তাই আজ দেখছিস তো ক্যালেণ্ডার, শুক্কুরবার হয়েও ছুটি। ইস্কুল-আপিস সব বন্ধ।'

'মিথ্যে কথা।' কোনো ব্যাখ্যাতেই বিচলিত নয় মন্তু।

'কী মিথ্যে কথা?'

'ঐ যে বলছ মা-মণি আজ আসবে না। মিথ্যে কথা। মা-মণি আজ আসবে, ঠিক আসবে।' রাস্তায় কী শব্দ শুনে মন্তু আবার বারান্দায় ছুটে গেল: 'ঐ এল বুঝি।'

পিছু নিল পিণ্টু। কই, কিছু না, ফক্কা।

'কী করে আসবে? শুক্কুরবার তো আর তার দিন নয়।' বললে পিণ্টু।

'হ্যাঁ, দিন। আজ যে বারই হোক, আজই মা-মণি আসবে। তুমি দেখে নিও।'

'তুই একটা গাধার মতন কথা বললে আমি শুনব কেন?' উকিলের মত তর্ক তুলল পিণ্টু। 'যদি আজ শুক্কুরবার হয় তা হলে কোর্ট থেকে তোর মা-মণিকে আসতে দেবে কেন?'

'দেবে। দেবে।' কেঁদে ফেলল মন্তু।

কান্না দেখে পিণ্টু দে-দৌড়।

'এ কী, কাঁদছিস কেন?' জেঠাইমা, সুভদ্রা দেবী, কোলের মধ্যে মন্তুকে জড়িয়ে ধরলেন। 'কে কী বলেছে?'

'বড় মা, আজ রবিবার না?' ডাগর চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল মন্তু।

'না কে বলছে?'

'পিণ্টু-দা বলছিল, আজ শুক্কুরবার। কোর্ট থেকে মা-মণিকে আজ আসতে দেবে না।'

'দেখেছ পিণ্টুটা কী বজ্জাত! ছেলেটাকে খেপাচ্ছে। এই, পিণ্টু! পিণ্টু!'

কোথায় পিণ্টু!

'ছেলেটা কবে থেকে দিন ঠেলছে। সেই বুধবার থেকে। কবে রোববার আসবে, কবে আসবে ওর মা-মণি!' মস্তুর মাথা-ভর্তি চুলে হাত বুলুতে লাগলেন সুভদ্রা। 'একদিনেই কেন দুটো করে বার আসে না, দিনে একটা রাতে একটা, রোববারটা কেন এত দেরি করে, কেন এত আস্তে হাঁটে—এ নিয়ে ছেলের কত আমাকে অনুযোগ।'

ইতিমধ্যে ছোট জা দীপিকা সামিল হয়েছে, তাকেই লক্ষ্য করলেন। 'তারপর বহু প্রতীক্ষার পর যদি রোববারের নাগাল পেল, তাকে বলা হচ্ছে কিনা, এটা শুক্কুরবার। হতচ্ছাড়াটা গেল কোথায়?'

সুভদ্রার শাড়ির আঁচলে চোখের জল মুছে এক মুখ সুখ নিয়ে মস্তু বললে, 'তাহলে মা-মণি আজ ঠিক আসবে বড়-মা?'

'আসবে তো! কিন্তু এখন তো প্রায় সাড়ে দশটা—' টেবিলের উপর টাইমপিস ঘড়িটার দিকে তাকালেন সুভদ্রা।

মস্তুকে এবার দীপিকা টেনে নিল। বললে, 'বেলা হয়েছে। চলো এবার তোমাকে চান করিয়ে দি।'

সজোরে হাত ছাড়িয়ে নিল মস্তু। বললে, 'না। আজ আমাকে মা-মণি চান করিয়ে দেবে।'

'রোজ তো আমিই করাই।'

'তার মধ্যে দু-একদিন মা-মণিকে ছেড়ে দিতে পারো না? মা-মণি কেমন সুন্দর আঁচল দিয়ে গা মোছায়—' মস্তুর চোখ আবার ছলছল করে উঠল: 'কত সুন্দর গল্প করে।'

'দে, ছেড়ে দে।' বললেন সুভদ্রা, 'এখুনি এসে পড়বে তপতী।

ছেড়ে দিতেই মস্তু ফের বারান্দায় চলে এল।

দেখতে লাগল, কোথায় কতদূরে রিকশা চলেছে। মা-মণি তো রিকশা করেই আসে। রাস্তাঘাট কোনো বারই তো ভুল হয় না। আজ দেরি হচ্ছে কেন?

খোলা রিক্সা যা দেখা যায় তা এক নজর তাকিয়েই নিশ্চিন্ত হতে

পারে মন্তু। ওসব রিক্সাতে মা-মণি নেই। মা-মণির রিক্সা ছপ্পর-তোলা। অমনতর ছপ্পর-তোলা রিক্সা দূর দিয়ে চলে গেলেই মন্তুর ভাবনা শুরু হয়, বুঝি ভুল পথ দিয়ে চলে গেল! বেশ তো, এদিকে দিয়ে একটু ঘুরে গেলেই হত! তাহলে মন্তু ঠিক বুঝতে পারত রিক্সাটাতে একটা বাজে লোক চলেছে।

'এই যে, এই বাড়ি।' কাছাকাছি একটা ঢাকা রিক্সা দেখে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছে মন্তু। পারে তো রাস্তায়ই নেমে পড়ে।

রাস্তার ধারের পানের দোকানের কাছে রিক্সাওয়ালাটা কী যেন হদিস নিচ্ছে, আর পানের দোকানের লোকটা মহাপণ্ডিতের মত হাত-মাথা নেড়ে দূরের কী একটা গলির ইশারা করছে। পানের দোকানের লোকটা কিচ্ছু জানে না। শুধু ভুল খবর দেয় আর খামোকা হায়রানি বাড়ায়। ঢিল ছুঁড়ে ভেঙে দিতে হয় দোকানটাকে।

ঠিক হয়েছে। রিক্সায় যে যাচ্ছে সে পানওয়ালার কথা শোনেনি, উল্টো দিকে, মন্তুদের বাড়ি দিকেই আসছে। জুতোর স্ট্র্যাপ আর শাড়ির পাড় দেখা যাচ্ছে। নির্ঘাৎ মা-মণি। নির্ঘাৎ।

না, অন্য কারু মা। রিক্সাটা সামনে দিয়ে চলে গেল ঘণ্টা বাজিয়ে।

পিন্টু আবার পাশে এসে দাঁড়াল।

'কেন মিছামিছি তাকিয়ে আছিস রাস্তার দিকে? তোর মা-মণি আজ আসবে না।'

টিটকিরি দিয়ে উঠল মন্তু, 'আজ শুক্কুরবার? তাই না? আজ লাল তারিখ? হেরে গিয়ে আবার কথা কইতে এসেছে!'

'হলই বা না আজ রবিবার। কিন্তু ঘড়ি দেখেছিস?'

'কেন?' ভয় পেল মন্তু। 'ঘড়িতে কটা বেজেছে?'

'বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট।'

'মিথ্যে কথা।' ঝামটা মেরে উঠল মন্তু।

'তা ঘড়িটা গিয়ে ছাখ না।'

অসহায় মুখ করে মন্তু বললে, 'আমি কি ঘড়ি দেখতে জানি?'

'তা হলে যা বলছি তা মেনে নে। আরো এক মিনিট এর মধ্যে কেটে গেল। তাহলে এখন বারোটা বাজতে চার মিনিট।' পিণ্টু মুরুব্বিয়ানা চালে বললে, 'এখন যদি তোর মা-মণি আসেও মোট চার মিনিট সময় তাকে তোর কাছে পাবি। এই চার মিনিটে না হবে স্নান, না বা খাওয়া, না বা কাছে নিয়ে একটু ঘুমোনো।'

'বড় মা! বড় মা!' চেঁচাতে শুরু করে দিল মন্তু। 'দেখ না পিণ্টু-দাটা আবার আমাকে খ্যাপাচ্ছে! জ্বালাচ্ছে!'

সুভদ্রা লম্বা হাঁক পাড়তেই পিণ্টু আবার অদৃশ্য হল।

বাইরের ঘরে ঢুকল এবার মন্তু। দেখল হিমাদ্রি তখনো খবরের কাগজ পড়ছে।

'কটা বেজেছে বাবা?' গা ঘেঁসে দাঁড়াল এসে মন্তু।

'য়্যাঁ?' চমকে উঠল হিমাদ্রি। দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। 'এগারোটা বাজে। একি, তোর মা-মণি আসেনি এখনো?'

এই মুহূর্তে তার জন্যে মন্তুর তত ভাবনা নেই, পিণ্টুর চালটা যে টিকল না এতেই সে খুশি। ম্লান মুখখানিতে হাসির রেখা ফুটিয়ে মন্তু বললে, 'পিণ্টুদা বলছিল বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট।'

'তা বারোটার আর বাকি কী! আসছে না কেন তোর মা-মণি?'

'কেমন করে বলি?' মুখে আরো এক পোঁচ কালি মাখাল মন্তু।

ঘড়ির দিকে আবার তাকাল হিমাদ্রি। প্রায় নিজের মনে বললে, 'আর কখনই বা আসবে! এলেও বা থাকবে কতক্ষণ। আর ঘণ্টাখানেক তো মেয়াদ।'

হিমাদ্রির গায়ের উপরে মৃদু হাত রাখল মন্তু। বললে, 'বাবা, তুমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসবে?'

'না, না, আমি যাব কোথায়?' খবরের কাগজেই মন দিল হিমাদ্রি।

'আমার মনে হচ্ছে কী জানো?' খুব বিজ্ঞের মত মুখ করল মন্তু। সর্বসমস্যাতেই মন্তুর এই কল্পনার দৌড়। আমার মনে হচ্ছে কী জানো? বলেই এক অদ্ভুত মন্তব্য।

সে মন্তব্য শোনার আর এখন স্পৃহা নেই হিমাদ্রির। স্বরে স্পষ্ট বিরক্তি এনে বললে, 'তোমার কী মনে হচ্ছে তাই জেনে তো আর কিছু এগুচ্ছে না। তুমি এখন যাও, কাকিমাকে বলো স্নান করিয়ে দিতে।'

দরজার পাশেই দীপিকা তৈরি। স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'চলে এস। কেমন তোমার জন্যে নতুন তোয়ালে এনেছি দেখ। রঙিন তোয়ালে।'

'না, না, মা-মণি আসবে। মা-মণি স্নান করিয়ে দেবে।' মন্তু আর্ত প্রতিবাদ করে উঠল।

'এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই। হিমাদ্রি আবার নিজের মনে তর্জন করে উঠল। 'ছেলেটা যে সকাল থেকে আশা করে থাকে, দেরি করে এলে যে ওর নাওয়া-খাওয়াও পিছিয়ে যায়, এতটুকু ভাবে না। সবটাই যেন ছেলেখেলা।' পরে ছেলের দিকে রুষ্ট চোখে তাকিয়ে বললে, 'না, আর দেরি নয়। বেশি দেরি করে খেলে শরীর খারাপ হবে। আজ কাকিমার হাতেই নাও-খাও গে। বৌমা, নিয়ে যাও মন্তুকে।'

চেয়ারের হাতলটা সজোরে আঁকড়ে রইল মন্তু। কান্নাভরা গলায় বললে, 'দেরি করে খেলে ককখনো আমার অসুখ করবে না। মা-মণিই আমাকে নাইয়ে-খাইয়ে দেবে। নাওয়ানোর সময় মা-মণি কেমন সুন্দর গান গায়। কাকিমা পারে গাইতে?'

'কিন্তু তোর মা-মণি না এলে কী করা যাবে? উপোস করে থাকবি?' হিমাদ্রি ঝাঁজিয়ে উঠল।

'ঠিক আসবে, ঠিক আসবে দেখো।' বিশেষজ্ঞের মত মুখ করল মন্তু। 'এর আগে আর কোনো রবিবারই তো মা-মণির দেরি হয়নি। আজ যখন দেরি হচ্ছে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।'

'কোনো কারণ নেই।' হিমাদ্রি অস্থির হয়ে উঠল। 'দিন-তারিখ স্রেফ ভুলে গিয়েছে। এত মত্ত, কোনো দিকে, পেটের ছেলেটার দিকেও আর হুঁশ নেই—'

'মোটেই তার জন্যে নয়।' আবার বিচক্ষণ টিপ্পনী কাটতে চাইল মন্তু, 'আমার মনে হচ্ছে কী জানো?'

'তোমার কী মনে হচ্ছে তা জেনে আমাদের কাজ নেই। তুমি এখন চলো, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে।' জোর করেই মন্তুর হাতের মুঠটা চেয়ারের হাতল থেকে আলগা করে নিল হিমাদ্রি। 'চলো, আমার সঙ্গেই চান করবে।'

'না, মা-মণি ছাড়া আর কারু সঙ্গে আমি চান করব না।' সাধ্যমত বাধা দিতে চাইল মন্তু।

'না, আর মা-মণি নয়।' হুমকে উঠল হিমাদ্রি।

'না, বারোটা পর্যন্ত তো দেখবে।' গাঢ়সিক্ত চোখে তাকাল মন্তু। 'কোর্ট তো বারোটা পর্যন্ত টাইম দিয়েছে।'

'তা হলে তুই বারোটার পর স্নান করবি?' মন্তুর হাত ধরে আবার টানল হিমাদ্রি।

বাইরে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। সোয়ারিকে নামিয়ে দিয়ে টুং-টুং-টুং করে তিনটি মিষ্টি শব্দ তুলল।

'এসেছে! এসেছে! মা-মণি এসেছে।' তিনটি মিষ্টি আওয়াজ তুলল মন্তু।

কখন অজান্তে হাত ছেড়ে দিয়েছে হিমাদ্রি, মন্তু ছুটে গিয়ে তপতীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল। উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'ট্যাক্সি করে এসেছ মা-মণি?'

'হ্যাঁ, ভাগ্যিস, পেলাম ট্যাক্সিটা।' মন্তুর গায়ে-পিঠে হাত বুলুতে-বুলুতে তপতী বললে, 'না পেলে আরো কত না জানি দেরি হত।'

'কিন্তু এত দেরি করার মানে কী?' প্রায় তেড়ে এল হিমাদ্রি।

যেন কৈফিয়ৎ চাইছে। যেন কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য তপতী। তবু ভুরু দুটো আপনা থেকে একটু কুঁচকে উঠলেও চোখে মুখে রাগ আনল না। বললে, 'সম্প্রতি শ্যামবাজারের দিকে গানের দুটো টিউশান পেয়েছি। রোববার সকাল ছাড়া ছাত্রীদের নাকি সুবিধে নেই। তাই টিউশান সেরে আসতে দেরি হয়ে গেল।'

'তোমার টিউশানে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই', রুক্ষস্বরে বললে

হিমাদ্রি, 'কিন্তু না-নেয়ে না-খেয়ে তোমার জন্যে কতক্ষণ হাপিত্যেশ করবে ছেলেটা ?'

হাত-ঘড়ির দিকে তাকাল তপতী। বললে, 'তা খুব বেশি আর কী দেরি হয়েছে ? এখন মোটে এগারোটা বেজে দশ। ছুটির দিন—'

'হোক ছুটির দিন। এগারোটার মধ্যেই ছোট ছেলেপিলেদের খাওয়া-দাওয়া সারা উচিত। সেই রকমই কথা।'

'কখন নাইতে হবে বা কটার মধ্যে খেতে হবে এমন কোনো নির্দিষ্ট কড়ার করে দেয়া হয়নি।' তর্ক করবে না ভেবেছিল, তবু তপতীর জিভে তর্ক এসে পড়ল। পরমুহূর্তেই আবার সামলে নিল তাড়াতাড়ি। 'যাক গে, এখুনি নাইয়ে-খাইয়ে দিচ্ছি সোনাটিকে।' বলে চিবুক ধরে মন্তুকে একটু আদর করল। গলা নামিয়ে বললে, 'তোমার জন্যে সেই জিনিসটা এনেছি সেই যে সেদিন চেয়েছিলে ?'

'এনেছ ?' মা মণির হাতব্যাগের দিকে লোলুপ দৃষ্টি ছুঁড়ল মন্তু।

ব্যাগের থেকে একটা কাগজের ঠোঙা বের করল তপতী। আর, ঠোঙার মধ্যে চোখ পাঠিয়ে মন্তু দেখল তার লোভনীয়তম সম্ভার, কাগজে মোড়া নানান রঙের লজেন্স আর টফি, আর ওগুলো বুঝি চকোলেট —

ঠোঙাটা তপতী মন্তুর দু হাতের মধ্যে সঁপে দিতে যাচ্ছে, ছোঁ মেরে সেটা কেড়ে নিল হিমাদ্রি। মুখিয়ে উঠে বললে, 'খাবার জিনিস এনেছ কোন সর্তে ?'

'ওগুলো কি খাবার জিনিস ?' তপতী হতভম্বের মত মুখ করল।

'খাবার জিনিস নয় কি দেখবার জিনিস ? ঘর সাজাবার জিনিস ?'

"কোনো রান্নাকরা জিনিস আনব না, এনে খাওয়াব না, যতদূর মনে হচ্ছে, এই তো আছে ডিক্রিতে।' পাংশু মুখে তাকাল তপতী।

'মোটেই তা নয়। লেখা আছে কোনো খাবার জিনিসই আনতে পারবে না, দিতে পারবে না ছেলেকে। খাবার জিনিসকে কোনোভাবেই কোয়ালিফাই করা নেই। দেখবে ডিক্রিটা ? পড়ে মনে করিয়ে দেব ?'

'না। তুমি যখন বলছ তখন সম্ভবত তাই আছে।'

'সম্ভবত ?' জ্বলে উঠল হিমাদ্রি।

তপতী আবার নম্র হল। 'সম্ভবত নয়, যথার্থই তাই আছে। কিন্তু এ সামান্য কটা লজেন্স—খোকন কত ভালোবাসে—এ ওকে দিতে তোমার আপত্তি কী ?'

'একশোবার আপত্তি। কোর্টের ডিক্রিতে যা বারণ বা নির্দেশ আছে তাই মানতে হবে অক্ষরে-অক্ষরে। এক চুল এদিক-ওদিক হতে পারবে না। তুমি যে আজ এ বাড়িতে ঢুকতে পেরেছ তাও কোর্টের কৃথায়। নইলে ঐ ট্যাক্সি থেকে তোমাকে আর নামতে হত না, ঐটে করেই ফিরে যেতে হত।'

'তা, সবই ঠিক কিন্তু লজেন্সে তো কিছু সন্দেহ করবার নেই।' করুণ চোখে তাকাল তপতী। 'আমি তো ওর সঙ্গে এমন নিশ্চয়ই কিছু মিশিয়ে আনতে পারি না যা খেয়ে আমার খোকনের অনিষ্ট হবে।'

'কী জানি কী হবে । আইনত আনতে যখন পার না আনবে না।' বলে ঠোঙাটা বাইরে রাস্তায়, গ্যাসপোস্টটার কাছে যেখানে আবর্জনার কুড় হয়েছে, সেইখানে ছুঁড়ে ফেলে দিল হিমাদ্রি।

মূক শোকে মস্ত তপতীকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরল।

তপতী এবার ফণা তুলল। 'খুব বাহাদুরি দেখালে।'

'আমি কেন দেখাতে যাব ? বাহাদুরি তো তুমি দেখালে ?' পালটা ছোবল মারল হিমাদ্রি ঃ 'আর কিছু পেলে না, ঢঙ করে সস্তায় কটা লজেন্স কিনে আনলে। নতুন সংসারে এর চেয়ে বেশি আর কিছু জুটল না।'

'সস্তা বলে নয়, সবচেয়ে নির্দোষ বলে লজেন্স এনেছিলাম। কিন্তু তুমি যে এখনো সেই আগের মতই ছোটলোক আছ তা বুঝিনি।'

'গালাগাল দেবে তো বাড়ি থেকে বার করে দেব।' তেরিয়া হয়ে দাঁড়াল হিমাদ্রি ঃ 'ছেলেকে ধরতে দেব না।'

সজ্ঝাতে দৃঢ় হল তপতী। 'রবিবার সকাল দশটা থেকে বারোটা

পর্যন্ত ছেলে আমার হেপাজতে—হলই বা না এ বাড়িতে—আমার হাতের মধ্যে। কেন, ডিক্রির সেই সর্তটা মুখস্ত নেই? বাধা দিয়ে দেখ না। দেখ না তখন পুলিশ ডেকে আনতে পারি কিনা। পুলিশ মোতায়েন রেখে পারি কি না ছেলেকে ধরতে।'

'কী তোরা এখনো ঝগড়া করিস!' সুভদ্রা এসে তপতীকে টেনে নিয়ে গেলেন। 'এদিকে খিদেয় ছেলেটার যে কী দশা তা কারু খেয়াল নেই। যা, ছেলেটাকে নাইয়ে-খাইয়ে দে শিগগির।'

মন্তুকে নিয়ে তপতী বাথরুমে ঢুকল।

কিন্তু আজ মন্তুর স্নানটা তেমন জুতসই হচ্ছে না। মা-মণির জল ঢালাটা কেমন যেন আজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে, লাইন দিয়ে বেয়ে গিয়ে ফোঁটা-ফোঁটা হয়ে ভেঙে যাচ্ছে না। তা ছাড়া আজ গান গাইছে না মা-মণি। জলধারানির গান।

বাথরুমের দরজায় ছিটকিনি লাগাবার হুকুম নেই। মন্তু শুধু আলগোছে ভেজিয়ে রেখেছে। হলই বা না সে মোটে পাঁচ বছরের, তবু সে মনে করে বে-আব্রু হবার মত সে অপোগণ্ড নয়। শুধু মা-মণির কাছে তার লজ্জা নেই।

বাথরুমের নিরিবিলিতে মন্তু ভার-ভার গলায় বললে, 'মা-মণি, আর কতক্ষণ বাদেই তো তুমি চলে যাবে। আবার আসবে সেই আরেক রবিবার।'

'কী করব বলো।' তোয়ালে দিয়ে মন্তুর গা মোছাতে-মোছাতে তপতী বললে, 'কোর্টের তাই হুকুম।'

'কোর্টটা খুব পাজি, তাই না?'

'ভীষণ।'

'আমি যদি পারতুম এক চড়ে ওকে উড়িয়ে দিতুম।'

'তাই দেওয়া উচিত।' মিষ্টি হেসে সায় দিল তপতী।

'আচ্ছা মা-মণি, আমার ইস্কুলে তো বেস্পতিবারটাও ছুটি। সেদিন আসতে পারো না?'

'কোর্টকে বলে দেখব।'

'হ্যাঁ, দেখো না বলে। শুনেছি', মুখে-চোখে বিজ্ঞ গাম্ভীর্য আনল মন্তু, 'কোনো-কোনা কোর্ট খুব ভালো। কথা শোনে।'

'হ্যাঁ, তারপর—' ষড়যন্ত্রীর মত গলা নামাল তপতী। 'তারপর তুমি বড় হবে। পথঘাট নিজেই সব চিনতে পারবে। কটা রাস্তার পরে এই কাছেই তো আমার নতুন বাসা। ঠিক পথ চিনে চলে যাবে একদিন। আমি যদি তোমাকে নিয়ে যাই, কোর্ট আমাকে বকবে, কিন্তু তুমি যদি চলে যাও একা-একা, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না—'

'কী মজা! তখন তোমার কাছে গিয়ে পড়লে তুমি আমাকে কত খাওয়াবে, কত জিনিস কিনে দেবে, কত গল্প বলবে টার্জানের—'

'কী, এতক্ষণ কী হচ্ছে?' ভেজানো দরজায় ধাক্কা মারল হিমাদ্রি।

'বাথরুমের দরজায়ও ধাক্কা মারার বিদ্যে হয়েছে নাকি আজকাল?' তপতী মুখের রেখাটা কুটিল করল।

'তা তোমার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তো।' নিষ্ঠুরের মত বললে হিমাদ্রি।

স্নান করাবার সময় হাতের ঘড়িটা খুলে রেখেছিল তপতী, তা ফের পরতে-পরতে বললে, 'আমার দিকে লক্ষ্য রাখবার আর তোমার এক্তিয়ার কী।'

'তোমার দিকে নয়। বলতে ভুল হয়েছে। আমার ছেলের দিকে।'

'কেন, ছেলেকে আমি কী করব?'

'কে জানে কী করবে! হয় তো নিরিবিলি পেয়ে কুশিক্ষা কুমন্ত্র দেবে। তোমার কিছুই অসাধ্য নয়। তাই চোখে-চোখে রাখা দরকার।'

'স্পাইং করতে পারবে কোর্ট এমন নির্দেশ দেয়নি তোমাকে।'

'এ আর নির্দেশ দেবে কী। এ তো স্বতঃসিদ্ধ। ছেলেটার কিছু অসুবিধে বা অনিষ্ট হচ্ছে কিনা এ তো খোলা চোখে পরিবার দেখবেই।'

'আমি মা হয়ে ছেলের অনিষ্ট করব?' জ্বলে উঠল তপতী।

'থাক, বেশি বক্তৃতা দিয়ো না। ছেলেকে খাওয়াবার কথা, খাওয়াও। তারপরে পথ দেখ।' বাইরের ঘরে চলে যাবার উদ্যোগ করল হিমাদ্রি।

কী একটা তপতী বলতে যাচ্ছিল, সুভদ্রা বাধা দিলেন। 'কথার তো শেষ হয়ে গিয়েছে, নতুন করে আবার কথা কেন?' ভাতের থালা রাখলেন টেবিলের উপর। 'খিদেয় ছেলেটার মুখ শুকিয়ে গেছে। নে, খাওয়া, ছেলেটাকে দুটো মিষ্টি কথা বল।'

মন্তুর পাশে আরেকটা চেয়ারে বসল তপতী। মন্তু নিজের হাতেই খেতে পারে। শুধু তাকে একটু মেখে দিতে পারলেই সে খুশি। আর নচ্ছার ঐ মাছের কাঁটাগুলো যদি একটু বেছে দাও।

'জানো মা-মণি, যদি একটা মাছের কাঁটা গলায় বেঁধে', হাসতে-হাসতে মন্তু বললে, 'তাহলে বাবা নিশ্চয়ই বলবে তুমি ইচ্ছে করে বিঁধিয়েছ।'

চোখ নিচু করে কাঁটা বাছতে-বাছতে তপতী বললে, 'আমি নাকি ছেলের অনিষ্ট করব আর তাই কিনা এরা পাহারা দিচ্ছে!'

দীপিকা টেবিলের কাছে ঘুর ঘুর করছিল, তাকে লক্ষ্য করে মন্তু চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি এখানে কী করছ? আমার আর কিচ্ছু লাগবে না। যদি লাগে মা-মণিই দিতে পারবে। তোমাকে সর্দারি করতে হবে না, তুমি চলে যাও।'

হাসতে-হাসতে দীপিকা চলে গেল রান্নাঘরে।

চারদিকে তাকিয়ে কেউ কোথাও নেই দেখে মন্তু বললে, 'তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা-মণি, আমাকে একটু পথঘাটটা চিনিয়ে দাও, আমিই ঠিক চলে যাব তোমার কাছে। বলো না মা-মণি, তোমার নতুন বাসাটা কেমন? কে কে আছে সে-বাসায়?'

তপতী দই দিয়ে ভাত মেখে দিতে লাগল।

বিবাহ-বিচ্ছেদের ডিক্রিটার নকলে আরেকবার চোখ বুলোলো হিমাদ্রি।

হ্যাঁ, স্পেশ্যাল ম্যারেজ য়্যাক্টের বিয়ে, আপোষেই বিচ্ছেদ করে নিয়েছে। আর যে কণ্টক-বীজ ফাটল ধরাবার মূল সেই হিমাদ্রির বন্ধু

অমিতাভকেই পরে বিয়ে করেছে তপতী। আর পূর্ব বিবাহের ফল যে একমাত্র সন্তান মন্তু, তার সম্বন্ধে আদালতের সাময়িক নির্দেশ হয়েছে যে সে তার বাবার কাছে, হিমাদ্রির অভিভাবকত্বেই থাকবে, শুধু প্রতি রবিবার দু ঘণ্টা, বেলা দশটা থেকে বারোটা, হিমাদ্রির বাড়িতে এসে তপতী ছেলের সঙ্গে থাকতে পারবে, যদি চায়, নাওয়াতে-খাওয়াতে পারবে। নাওয়াতে মানে হিমাদ্রিদের বাড়ির জলে নাওয়াতে, খাওয়াতে মানে হিমাদ্রিদের বাড়ির রান্না খাওয়াতে। ঐ দু ঘণ্টার মধ্যে তপতী ছেলেকে বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না, কোনো জিনিস উপহার দিতে পারবে না, চাই কি, ছেলে নিয়ে নিরালা হতে পারবে না। সকলের চোখের সমুখে ব্যয় করতে হবে সেই দু ঘণ্টা।

হ্যাঁ, রবিবার, দু ঘণ্টা। আরেকবার ভালো করে দেখে নিল হিমাদ্রি। হ্যাঁ, রবিবার যে কোনো দু ঘণ্টা নয়, নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, বেলা দশটা থেকে বারোটা।

হঠাৎ দ্রুত পায়ে খাবার ঘরে ঢুকে হিমাদ্রি তপতীর হাতের তলা থেকে ভাতের থালাটা কেড়ে নিল। পরুষ কণ্ঠে বললে, 'তুমি এবার ওঠো, বারোটা বেজে গিয়েছে, চলে যাও এবার।'

'সে কী?' মূঢ় নিস্পন্দ হয়ে রইল তপতী।

'নিজের হাতেই তো ঘড়ি বেঁধে এনেছ। দেখ না কটা।'

'আহা, ছেলেটা শেষ ভাত কটা খাচ্ছে দই দিয়ে—'

'খাবে, নিশ্চয়ই খাবে। দই-মাখা ভাত ও নিজেই খেতে পারবে হাত দিয়ে। তোমাকে আর সাহায্য করতে হবে না। তোমার টাইম-লিমিট পার হয়ে গিয়েছে। উঠে এস টেবিল ছেড়ে।'

তপতী নড়ল না। বললে, 'মোটেই পার হয়ে যায়নি। আমার দু ঘণ্টা থাকবার কথা। দু ঘণ্টা হয়নি এখনো।'

'তোমার ইচ্ছেমত দু ঘণ্টা নয়। দশটা থেকে বারোটা দু ঘণ্টা। উঠে এস বলছি। আমাকে না মানো কোর্টকে তো মানবে। আর কোর্টকে যদি না মানো অন্য উপায় দেখতে হবে।'

'তার মানে গায়ের জোর ফলাবে ?'

'ওভারস্টে করতে চাইলে তাই করতে হবে বৈকি। বেলা বারোটার পর তুমি তো ট্রেসপাসার—'

'একেই বলে ছোটলোক।' উঠে পড়ল তপতী।

থালাটা তখন মন্তুর সামনে নামিয়ে রাখল হিমাদ্রি। বললে, 'আর তোমাকে কী বলে তা আর ছেলেটার সামনে শুনতে চেয়ো না।'

এই নিয়ে তুমুল শুরু হয়ে গেল।

আর সেই ঝগড়ার মধ্যে দই-মাখা ভাত কটা নীরবে খেতে লাগল মন্তু।

পরের রবিবার আবার তপতী এল। তেমনি দেরি করে।

কিন্তু আশ্চর্য, মা-মণিকে দেখে আজ মন্তুর এতটুকু উৎসাহ নেই। এতক্ষণ যে প্রতীক্ষা করে আছে, দুই চোখে নেই সেই ঔজ্জ্বল্য। ছুটে এসে কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না। উথলে উঠছে না আনন্দে।

দরজা ঘেঁষে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায়, নায়নি, খায়নি। চুলগুলি রুক্ষ, হাতে-পায়ে ধুলো, মুখখানি শুকনো।

নিজেই ছেলের দিকে হাত বাড়াল তপতী।

কী আশ্চর্য, মন্তু গুটিয়ে গেল, পিছিয়ে গেল।

'সে কী, চান করবে না আজ ?' দু পা এগিয়ে গেল তপতী।

'না।' সরে গেল মন্তু। 'কাকিমা চান করিয়ে দেবে।'

তক্ষুনি, কোত্থেকে, দীপিকা এসে হাজির। মন্তুর গা থেকে জামাটা খুলে নিয়ে দিব্যি তার গায়ে-মাথায় তেল মাখিয়ে দিতে লাগল।

আর দিব্যি তাই চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল তপতী।

'কার হাতে খাবে ?' তপতী আবার জিজ্ঞেস করল।

কেউ শিখিয়ে দিচ্ছে না, মন্তু নিজের থেকেই বলছে, 'কাকিমার হাতে।'

ম্লান রেখায় হাসল তপতী। বললে, 'কেন, আমি কী দোষ করেছি ?'

চোখ নত করে মন্তু মাটির দিকে তাকাল। বলল, 'তুমি এসেই বাবার সঙ্গে ঝগড়া করো, অশান্তি করো। তাই তোমার হাতে আর নাব না খাব না।'

দীপিকা কত সহজে বাথরুমে টেনে নিয়ে গেল মন্তুকে। মন্তু একবার ফিরেও তাকাল না।

'ওর বাবা কোথায়?' পিণ্টুকে জিজ্ঞেস করল তপতী।

'বাড়ি নেই।' পিণ্টু পালিয়ে গেল সামনে থেকে।

হিমাদ্রি বারোটা বাজিয়েই তবে বাড়ি ফিরল। এসে দেখল তপতী তখনো বসে আছে।

'তোমার জন্যেই বসে আছি।' তপতী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে।

'এস বাইরের ঘরে। ঐ ঘরটাই এখন নিরিবিলি।'

দুজনে মুখোমুখি বসল দু চেয়ারে। 'তোমার কাছে আমার একটি মিনতি আছে।'

'কী, বলো?' সমস্ত ভঙ্গিটা কোমল করল হিমাদ্রি।

'রোববার-রোববার যখন আসব তখন তুমি আমার সঙ্গে একটু ভালোবাসার অভিনয় করবে।'

'কিসের অভিনয়?' চমকে উঠল হিমাদ্রি।

'ভালোবাসার অভিনয়।'

'তার মানে?'

'ছেলেটা আজ আমার হাতে নাইল না, খেল না, কাছেই এল না। বললে, তুমি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করো, অশান্তি করো, তোমার হাতে নাব না খাব না।' বলতে বলতে তপতীর চোখ ছলছল করে উঠল।

'আমাকে কী করতে হবে বলো?' সহানুভূতিতে আর্দ্র হিমাদ্রির কণ্ঠস্বর।

'ওর সামনে আমাকে একটু মিষ্টি করে কথা কইবে, কথায় আদর দেখাবে, একটু বা ভালো বলবে আমার। পারবে না?' সজল চোখ তুলল তপতী। 'এমন একটা ভাব দেখাবে যে আমি তোমার পর নই,

তোমার পর না হলে ওরও পর নই ও ভাববে। আমাকে দেখে খুশি-খুশি ভাব করবে, এস-এস ভাব করবে, একটু খাতির-যত্ন করবে—'

'সে আর কী করে হয়?' গম্ভীর হল হিমাদ্রি। 'সে আর হয় না।'

'তোমার পায়ে পড়ি, কেন হবে না? আমি তো আমার জন্যে বলছি না, ছেলেটার জন্যে বলছি।' অঝোর কাঁদতে লাগল তপতী 'নইলে বলো, আমি আসব আর মস্ত দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে, আমাকে পর ভাববে, শত্রু ভাববে, আমার কাছে আসবে না, আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে না, আমাকে নাওয়াতে-খাওয়াতে দেবে না—এ আমি কী করে সহ্য করব?' দু হাতে মুখ ঢাকল তপতী।

কখন এক ট্যাক্সি এসে থেমেছে দরজায়, কেউ খেয়াল করেনি।

অমিতাভ ঘরে ঢুকে একেবারে থ হয়ে গেল। বলল, 'এ কী, এত দেরি হচ্ছে কেন? দেরি দেখে ভয় হল কোনো বিপদটিপদে পড়লে নাকি? এখন প্রায় একটা।'

তপতী পত্রপাঠ উঠে পড়ল। দ্রুত আঁচল বুলিয়ে মুছে নিল চোখ-মুখ। কোন দিকে দৃকপাত না করে—ট্যাক্সিটা অমিতাভ ছেড়ে দেয়নি—ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল।

অমিতাভ পাশে বসল।

'আমি কিন্তু এতক্ষণ ছেলের জন্যে কাঁদছিলাম।' ট্যাক্সিটা চলতেই অন্যমনস্কের মত বললে তপতী।

অমিতাভ একটাও কথা বললে না। নীরবে সিগারেট ধরাল।

ফুল ভালোবাসে তনিমা। তা কে না বাসে সংসারে।

— ফুল ভালোবাসা এক, ফুল ভালোবেসে নিজে ফুল হয়ে ফুটে-ওঠা আরেক। ফুল হাতে পেলে তনিমা আনন্দে এত বিহ্বল হয়, তখন কে যে ফুল কে যে মানুষ আলাদা করা যায় না।

একদিন সিগারেট কেনবার সখ হয়েছিল সুজিতের। কি খেয়াল হল একগুচ্ছ রজনীগন্ধা আর একটা জুঁইফুলের মালা কিনে আনল।

বাড়িতে ঢুকেই বলে উঠল সুজিত, 'বড় একটা ভুল হয়ে গেল তনু—'

রান্না করছিল তনিমা। রান্নার ঝাঁজ ছাপিয়ে আর কি এক গন্ধ তার নাকে ঢুকল। ভিজে হাত আঁচলে মুছতে-মুছতে ছুটে এল ঢেউয়ের মত। ঝাঁপিয়ে পড়ে রজনীগন্ধার গুচ্ছটা নিল হাত বাড়িয়ে। জিগ্‌গেস করল, 'কিসের কি ভুল হল ?'

'আজও ফুলদানি আনা হল না।'

সন্দেহ নেই, এ নিয়ে অনেক খোঁটা দিয়েছে তনিমা। রজনীগন্ধার দীর্ঘ বৃন্তগুলিকে ছাঁটাই করে নিয়ে একটা জল-ভর্তি কাঁসার গ্লাসে ডুবিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। গন্ধ থাকলেও ছন্দ নেই শ্রী নেই।

আগে ফুলদানি, পরে ফুল। আগে মনিব্যাগ পরে টাকা।

এসব কথা পরে বিবেচনা করা যাবে। আগে ফুলটাকে একটু আদর করি।

কলাপাতায় মোড়া জুঁইয়ের মালাটা একটু বুঝি চোখের আড়ালে রাখতে পেরেছিল সুজিত। মালাটা নিজের হাতে ঝুলিয়ে দিল গলায়। বললে, 'তোমায় সাজাব যতনে, কুসুমে রতনে—'

'একটা ফুলদানি কিনতে পারলে না, তায় আবার রতনে সাজাবে—' কথার পিঠে কথা একটা বলতে হয়, তাই বলল তনিমা, কিন্তু ঝিরঝিরে

জলের উপর জ্যোৎস্না পড়লে যেমন দেখায় তেমনি ঝিলমিল করে উঠল।'

কিন্তু জলের গায়ে 'কোথায় যেন একটি বিষাদের রেখা আঁকা রইল, শত জ্যোৎস্নায়ও তা ধুয়ে গেল না।

করুণ দুটি মনিবন্ধের দিকে চাইল সুজিত। ঘসা-ঘসা সরু-সরু পাতলা কটি সোনার চুড়িতে কেমন নিরীহ দেখাচ্ছে।

বড় সখ তনিমার মোটা-মোটা দুটো বালা পরে। সঙ্গে আর কোনো ফেউ থাকবে না, নিছক টাকা দুটি বালা। গলার চলটাও কেমন ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখায়। সরু সোনার একটা সুতলি আছে বটে কিন্তু চোখে পড়ে কি না পড়ে। একটা লকেট থাকলে যেন ভরা-ভরা হত। শুভ্রতার শূন্যতা ঢাকা পড়ত।

আর সাজলে-গুজলেই বা কি। ঘরে একটা বড় আয়না নেই।

সুজিতের দাড়ি কামাবার ছোট আয়নাতেই তনিমা চুল বাঁধে, মুখ দেখে কপালে টিপ আঁকে।

একটা বড় আয়নার খুব সখ। ঘরের জানলা দিয়ে শুধু এক কোণের ছিটেফোঁটা তারা নয়, বাইরে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে সমস্ত আকাশটাকে দেখতে ইচ্ছে করে একসঙ্গে।

শুধু নিজেকে দেখে নিজের সুখ নেই। লুকিয়ে লুকিয়ে আরেকজন হয়ে নিজেকে দেখতে সাধ হয়। দর্পণের সেই ছায়াই তার আরেকজন। তার প্রচ্ছন্নের দেশের বন্ধু।

মাঝে মাঝে মনের ইচ্ছার কথা বলে বসে তনিমা।

'তোমার কাছে না বলব তো কার কাছে বলব।'

বলে বটে কিন্তু কখনো জেদ করে না, পিড়াপিড়ি করে না। যন্ত্রণা-অশান্তির ধার ঘেঁসেও আসে না। শুধু বলতে হয় বলে। ঘ্যানঘ্যান করে না, টানা সুরে নাকী কান্না কাঁদে না, ঘোষণা-ভীষণা হয়ে ওঠে না। নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেয় না।

তনিমা তো জানে কেন এই কষ্ট।

সত্যি তনিমা কত ভালো কত বুদ্ধিমতী।

বলে, যতই সাজিনা কেন, এক সময় না একসময় খুলে ফেলতেই হবে। কিন্তু এমন কি কিছু নেই যা সাজেও সাজ অসাজেও সাজ।

সুজিত চেয়ে থাকে। বলে, 'জানি—'

'কি?'

'তার নাম রূপ।'

'মোট্টেও না। তার নাম ভালোবাসা।'

বলেই তনিমা আবার ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, 'একটা ছোট হাতঘড়ি হবে ভেবেছিলাম। যখন স্কুলে পড়তাম তখন দুটো সখ ছিল, একটা ঝর্ণা-কলম আরেকটা হাতঘড়ি। ভাবতাম কলেজে গেলে হবে। কলেজে এসে ভাবলাম বিয়ের পরে হবে। আর, বিয়ের পরে—'

'পেন হলে ধোপার হিসেবটা লিখতে পারতে আর হাতঘড়ি দেখে বুঝতে পারতে কতক্ষণে কচুঘেঁচুটা সেদ্ধ হয়—'

হেসে ওঠে তনিমা। বলে, 'যাই বলো এসব এসেনশিয়াল নয়। কিন্তু এমন মজা যা প্রয়োজনীয় নয় তারই যেন যত শোভা।'

'কে জানে শোভাই হয়তো প্রয়োজনীয়।' তনিমার প্রতি সহানুভূতিতে বলে সুজিত।

'তুমি সেই বড় কথাটা বললে না?'

'কী বড় কথা?'

'সন্তোষই প্রয়োজনীয়।'

'একেক সময় বলি না। মনে হয় ওটা দুর্বলের কথা, হতাশের কথা—'

স্বামীর মুখের দিকে তাকায় তনিমা। কত মহৎ তার স্বামী। কত ভালো। কত জানে ত্যাগ স্বীকার করতে।

বিকেলে একটা টি-পার্টিতে নেমন্তন্ন ছিল দু জনের।

তনিমা বললে, 'আমি যাব না।'

'কেন?'

'কথা ঢেকে লাভ কি, আমার একটাও শাড়ি নেই।'

'যা আছে তাই পরে যাবে।'

'এইসব আটপৌরে শাড়ি পরে যাওয়া যায়?'

'ফর্সা হলেই যাওয়া যায়।'

'এসব একেবারে খেলো—'

'তুমি যদি না যাও তাহলে আমি হেরে যাব।'

'আর যদি যাই?'

গেল তনিমা। খেলো আটপৌরে শাড়ি পরেই গেল।

একটা রেডিয়োর বড় সখ। শস্তায় কত দামে নাজানি পাওয়া যায়।

'একা একা থাকি, যখন তুমি টুরে, তখন—'

স্বজিত চঞ্চল হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ততার নতুন চিহ্ন, রেডিও কোন বাড়িতে নেই! কিন্তু তাও সে একটা পারেনি কিনে দিতে।

তনিমা তক্ষুনি আবার সংশোধন করে। বলে, 'থাকগে ও আবার একটা যন্ত্রণা। তোমাকে যা শোনাবে তুমি তাই শুনতেই বাধ্য। এপার থেকে চেঁচিয়ে জানানো যাবে না আপত্তি। মুখ বুঝে সব মেনে নিতে হবে। তোমার নিজের কোনো স্বাধীনতা নেই।'

কোথাও নেই।

খেতে-পরতে চলতে-ফিরতে সব সময়েই তুমি অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে। অন্যে কি খায়-পরে, কেমন চলে-ফেরে। আর তাই মিলিয়েই তোমার যত কাতরতা।

ফুলের মালাটা গলা থেকে তুলে নিয়ে নিজেই খোঁপায় জড়াল তনিমা। বললে, 'মালাটা না আনলে পারতে। রজনীগন্ধাই তো ভালো ছিল। পয়সাটা বরং আমাকে দিলে—'

'কি করতে? তেল-নুন-মশলা—'

'মোটেও না। জমাতাম।'

তাই অহর্নিশ চেষ্টা করে। তিল তিল ক'রে করে। এখানে-ওখানে খুঁটে-খুঁটে, কুড়িয়ে-বুড়িয়ে। একটি পয়সা দুটি পয়সা করে। একটা

এনামেলের কৌটো আছে, তাই ভর্তি করে। ডালা বন্ধ করে বাজায়। শূন্যে তুলে-তুলে ওজন নেয়। মনে-মনে গোনে। শেষে সব ঢেলে দিয়ে গোনে আবার নতুন করে।

কখনো-কখনো টাকাও যে না জমে তা নয়। যখন সুজিত টি-এ করে। এদিক-সেদিক করে কটা পয়সা বাঁচায়। তাই হাতে করে এনে দেয় তনিমাকে।

আবার কখনো তনিমার কাছেই হাত পাতে দুঃসময়ে।

স্বামীকে কম-সম করে কিছু কিছু দেয়। বলে, 'একটা রেডিও প্রায় হতে যাচ্ছিল, ওটাকে এখন তোমার হাতঘড়িতে নামিয়ে আনবার মতলব। শেষে বলবে হাতঘড়িকে এবার একটা শাড়িতে নামিয়ে আনো।'

পরের টি-এটা পুরোপুরি ঢেলে দেয় অঞ্জলিতে।

ছাপিয়ে পড়ে।

কত অল্পেই তনিমা খুশি।

'মোটেই অল্পে আমি খুশি নই। আমি জমিয়ে-জমিয়ে এ দিয়ে একটা ছোটখাটো বাড়ি করব। দু টাকার এই নোটটা ছেঁড়া, এটা দাগ ধরা। এসব ছেঁড়াখোঁড়া নোট এনেছ কেন?'

জমাবার নোটগুলি নতুন হওয়া চাই, নিভাঁজ-নিদাগ হওয়া চাই। খুচরো আধুলি-সিকিগুলিও চাই ঝকঝকে, করকরে।

'আচ্ছা, ঐ লোকটা কে অত ঘুরঘুর করছে বল তো?'

'কোথায়?

'ঐ বাইরে, গলিতে—'

'কে আবার!' জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল সুজিত।

আভাসে চিনতে পারল বোধ হয়।

বললে, 'দেখিগে।'

দুখানা ঘরে ও বারান্দায় ছোট মফস্বলের কোয়ার্টার। কিন্তু সাত রাজার ধন এক মানিক, ছাদ আছে, আছে ছাদে ওঠবার সিঁড়ি।

শোবার ঘর থেকে বাইরের ঘরে এল সুজিত। দেখল সেই মহাদেব।

'একি, আবার এসেছেন আপনি?' জ্বলে উঠল সুজিত।

'এ বিপদ থেকে আপনি যদি না বাঁচান—'

'বিপদ কোথায়? প্রকাণ্ড ব্যবসা আপনার। বিস্তর বিক্রি—' পাছে কথা বাড়ায় তাই বসতে বলল না সুজিত।

'বাইরে থেকে অমনি দেখতে। কিন্তু খরচ কত। বিরাট সংসার কাঁধের উপর। ছোট ভাইটা—'

এখানেও ছোট ভাই! সুজিত চমকে বললে, 'ছোট ভাইয়ের কি?'

'তার টি-বি। স্যানিটোরিয়ামে আছে। মস্ত খরচ। মাসে তিনশোর উপর।'

সুজিতের ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ারিঙ কলেজে ঢুকেছে। মাস-মাস তাকেও পাঠাতে হয় এক ঝুড়ি। তবু তো বছর কয়েকের পর আসবে বেরিয়ে। তারই পথ চেয়ে বসে আছে সংসার। কিন্তু মহাদেবের ছোট ভাই কবে আসবে?

নিজের কথা ভাবো। নিজের চরকায় তেল দাও।

'ছুটো বোন বিয়ের যুগ্যি—'

সে তো সুজিতেরও। কলকাতায় ভাড়াটে বাড়িতে মা তাদের নিয়ে থাকে। আর হাত দিয়ে হাতি ঠেলে।

বোনেদের বিয়ে দিতে হবে, ভাইদের মানুষ করতে হবে—পেলই না হয় দোহারা মাইনে—ওসব খরচা চালিয়ে থাকবে কী—অকালে বাবা মারা গেল—তনিমার বিয়ের আগে অনেক গবেষণা করেছিল তার বাপ-মা। ঘাড়ে-পড়া কেউ নেই, ছুজন মাত্র মানুষ, স্বামী-স্ত্রী, যার পাঁচশো মত মাইনে, মফস্বলী চাকরি—এমনটি হলে, জাছুকরের হাতে খাপ-খোলা নতুন তাসের মতই একটার পর একটা উড়ে যেত দিনগুলি। কিন্তু এত সব বোঝা নিয়ে চলবে কি করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে? তা কটিই বা বছর! ছোট ভাই বেরিয়ে আসবে দেখতে-দেখতে, বোনেরা

বাপের বাড়ির চৌকাঠ পেরোবার জন্যে মুখিয়ে আছে। তা ছাড়া ছেলেই আসল। দেবতাই আসল—তার বাহনের কে খোঁজ নেয়?

'তা আপনার পারিবারিক সমস্যার সঙ্গে এর যোগ কোথায়?' সুজিত রুক্ষ হবার চেষ্টা করল।

'টাকাটা যে স্যার একসঙ্গে দিতে হবে।'

'লাভ করেছেন ব্যবসায়, ট্যাক্স দেবেন না? বিক্রির স্টেটমেণ্ট সব আপ-টু-ডেট দেবেন, আর সব ভাউচার। নয়তো অনেক বেশি এসেসমেণ্ট হয়ে যাবে।'

'মাপ করে দিন।' হাত জোড় করল মহাদেব।

'আমি মাপ করবার কে?'

'আপনি ইনস্পেক্টর, আপনিই সব। আপনি ইচ্ছে করলে—'

'আমি ইচ্ছে করলেই হবে? আমার ইচ্ছেতেই সব চলছে?'

'এ পর্যন্ত তো হয় নি। আপনার আসবার আগে—'

'আগে হয়নি বলে এখন হবে না?' প্রায় মুখের উপর ধমকে উঠল সুজিত। 'আগে আপনার ব্যবসা মন্দা ছিল, বিক্রি কম ছিল, হয়নি। এবার যদি মুনফা বেশি খেয়ে থাকেন কিছু উগরে দিতেই হবে।'

'অন্তত একটা নমিন্যাল কিছু ধরুন। কম-সম করে না নিলে—'প্রায় পায়ের কাছে নিচু হতে চাইল মহাদেব।

দু পা সরে গেল সুজিত। কঠিন হয়ে বললে, 'এ সব কী? তেল মেখেছেন এখন কিছু কড়ি ফেলুন। লোকের কাছ থেকে নিয়ে তেল মেখেছেন এখন সরকারের ঘরে কিছু কড়ি ফেলুন।'

'আপনি যদি না মুখ তুলে চান—' আবার সেই ঘ্যানঘ্যান।

'আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি আগে স্টেটমেণ্ট আনুন, ভাউচার আনুন, দেখি কতদূর কি দাঁড়ায়'—ফুলের সন্দেটা ধুলো করে দিয়ে গেল লোকটা।

পরদিন সন্ধ্যায় বাইরের ঘরে বসে কাজ করছে সুজিত আর আশে-পাশে কর্মরত তনিমার পায়ের শব্দ শুনছে—মহাদেব ঘরে ঢুকল।

'নিয়ে এসেছেন ?'

'নিয়ে এসেছি।'

'কই ?' মহাদেবের শূন্য হাতের দিকে সবিস্ময়ে তাকাল সুজিত।

হাত শূন্য নয়। মহাদেবের হাতের মুঠোর মধ্যে ভাঁজকরা কতগুলি দশ টাকার নোট।

'এ কি, এই আপনার স্টেটমেন্ট নাকি ? এই আপনার ভাউচার ?'

'এই একশোটা টাকা নিন—'

'এ অসম্ভব কথা। এ সব চলবে না এখানে।'

একটু কি বেশি রকম ভদ্রতা হয়ে গেল ? কেউটে সাপ দেখলে লোকে যেমন আঁতকে ওঠে তেমনি করেই কি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠা উচিত ছিল না ? কিংবা ডাকাত পড়লে লোকে যেমন চিৎকার করে ওঠে তেমনি রব তোলা ? উচিত ছিল না কি হৈ-হল্লা করে লোক জমানো ? আগুন লাগলে কেমন করে ওঠে ঘরের বাসিন্দেরা ? কিংবা কেউ ছোরা তুলে মারতে এলে ?

শুধু চেয়ারে বসে থেকে নিষ্ক্রিয় কণ্ঠে ঘোষণা করলেই কি চলে : এ সব চলবে না এখানে, এ অসম্ভব কথা !

'আমি আর কিছু জানি না। আপনিই আমার মা-বাপ।' ভাঁজ করা নোট কখানার একটা কোণ টেবিলের উপর একটা মোটা বইয়ের নিচে গুঁজে দিয়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল মহাদেব।

এখন কি করা ! পুলিশকে খবর দিতে হয়।

বাইরে সহসা কতগুলি দ্রুত পায়ের জুতোর শব্দ উঠল। রাস্তার দিকের জানলার পাশে উকি-মারা দুটো লোক। বিদ্যুতঝলকের মত বুঝতে পারল সুজিত, মহাদেব একবারে পুলিশ নিয়েই এসেছে। শুধু পুলিশ নয় দুটো সাক্ষী পর্যন্ত। হয়তো নোটগুলি আগের থেকেই চিহ্নিত করা। মুহূর্তেই ঝড়ের মত ঢুকে পরবে দলবল।

ঠাণ্ডা একটা ভয় সুজিতের মেরুদণ্ড বেয়ে সিরসির করে উঠল মাথার মধ্যে।

নিজের ঘরের টেবিলের উপর বইয়ের নিচে টাকা আছে এতে কি কখনো ঘুষ নেওয়া হয়? কে জানে সূক্ষ্ম বিচার! সব চেয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যদি এগুলোকে নিশ্চিহ্ন করা যায় মুহূর্তে।

কোথায় সরাবে? টেবিলের টানার মধ্যে? কোনো বইয়ের গহনে? পাপোষটার নিচে? দরকার নেই। পুলিশের সন্ধানী চোখকে এড়ানো যাবে না।

টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে? ছেঁড়া টুকরোগুলো ফেলবে কোথায়? হাতে করে ধরে ছিঁড়ে ফেললে সেই নেওয়াই তো হয়ে গেল। নিজের টাকা নিজের নষ্ট করা হল।

সব চেয়ে ভালো হয় যদি তনিমার হাতে চালান দিয়ে দেওয়া যায়। তনিমা সহজেই তা উনুনে গুঁজে দিতে পারবে, কিংবা পারবে অন্যত্র লুকিয়ে রাখতে। তার ব্লাউজের মধ্যে ফেলে দিতে পারলেই তো একেবারে নিশ্চিন্ত।

তখন চারদিকে নির্মলের হাওয়া, নির্ভয়ের হাওয়া।

সময়ের একটা আলপিনের বিন্দুতে এসে ভাবনা তুলতে লাগল। বিদ্যুৎ ঝলকের চেয়েও শীঘ্র ভিতরে গেল সুজিত।

'তনু! তনু!'

যেন বিপন্নের ডাক।

তক্ষুনি ছুটে এল তনিমা।

'শিগগির শিগগির এঁ নোটগুলি সরিয়ে ফেল।' ব্যস্তত্রস্ত হয়ে নোটগুলি তনিমার হাতে দিয়ে দিল সুজিত।

তক্ষুনি ঢুকে পড়ল শাদা পোশাকে কতগুলি পুলিশী লোক। মহাদেব ইঙ্গিত করল, কিন্তু বইয়ের নিচে নোট নেই। হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

একজন কি সাহসে ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে।

ছাদের সিঁড়ির ধাপে বসে তনিমা নোট গুনছে। দেখছে সত্যি কতগুলি, কোনটাতে বা নতুন ছাপ, নতুন নম্বর।

লোকটা হাত বাড়িয়ে বললে, 'দেখি নোটগুলো।'

তনিমা হতচকিতের মত তাকাল এক মুহূর্ত। কি ভাবল কি বুঝল, দিয়ে দিল।

পুলিশ গ্রেপ্তার করল সুজিতকে।

তনিমার সমুখ দিয়েই নিয়ে গেল হাঁটিয়ে। একটাও কথা বলল না সুজিত। কি রকম করে যেন তাকাল তনিমার দিকে। যেন বললে, 'বোকা, লোভী কোথাকার।'

তনিমা চুপ করে রইল। মুখ ফিরিয়ে নিল। কি রকম করে যেন তাকাল সুজিতের দিকে। যেন বললে, 'চোর, ঘুষখোর।'

কটাক্ষ

দু'ভায়ে ঝগড়া।

এমনিতে মিল-মিশ ছিল; যেই বাপ বিষয় রেখে গেল, লেগে গেল লাঠালাঠি।

গাঁয়ের মাতব্বর এল সালিশ করতে। বিষয়-আশয় ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নাও, হ্যাঙ্গাম চুকে যাক।

কথাটা ভাল। যার যার তার তার।

ঘটিবাটি বাসনকোসন গরু-লাঙল সব ভাগ হল। দাগ-প্লট ধরে জমিজমা। কিন্তু পুকুর? পুকুরটা এজমালি। কী করে ভাগ হবে?

একজনকে গোটা পুকুরটা দিয়ে আরেকজনকে জমি দিয়ে ভরিয়ে দাও। কিছুতেই রাজি হয় না কেউ। পুকুর ছাড়তে কেউ রাজি নয়। দুজনেরই পুকুর চাই।

তাহলে এজমালিতে ভোগ কর।

কী সর্বনাশ! এজমালিই যদি থাকব, তবে তোমাকে ডেকেছি কেন? মাতব্বরের দুহাত ধরে দুজনে টানাটানি করতে লাগল। আশমান-জমিন পুকুর-পাঁহাড় সব ভাগ করে দিতে হবে।

তাহলে এক কাজ কর। দা আর দড়ি নিয়ে এস। আর দুটো খুঁটি কাট।

পুকুরে নামল মাতব্বর। মাঝবরাবর দিয়ে এগুতে লাগল, দা দিয়ে জল কেটে কেটে। বললে, 'এ ভাগটা তোর, ও ভাগটা ওর। জল যখন কাটা হল তখনই পুকুর ভাগ হয়ে গেল। এবার দড়ি ফেলে সীমানা ঠিক করে দি।' দড়ির এক মাথা এ-পাড়ের খুঁটিতে, আরেক মাথা ওপারের।

বাঁ, দিব্যি ভাগ হয়ে গেল পুকুর। দু ভাই মহাখুশী।

মাছের দল যেমন-কে-তেমন খলবল খলবল করতে লাগল। দড়ির তলা দিয়ে যাওয়া-আসা করতে লাগল এপার-ওপার।

পাকিস্তান থেকে আসে সুপুরি, মার্কিনী মনোহারী, আর ভারত থেকে চলে যায় চাল, কাপড়, তেল, চিনি, কলকব্জা, মশলাপাতি।

জল কেটে পুকুর ভাগ করে দিয়েছে মাতব্বর। কিন্তু জমি?

কোথায় যে লাইন পড়েছে, সেই অদৃশ্য কল্পনার সুতো, কে বলবে। সেই ঝোপ জঙ্গল, সেই বনবাদাড়, সেই মাঠপথ, সেই খাল-বিল। তবু বলে এ-দেশ তোমার নয়, ও-দেশ তোমার। রাইপদ ত দেখে সেই একই মাটির চেহারা, একই আকাশের রঙ। কতক্ষণ ধরে যে হাঁটছে খেয়াল নেই। হাঁটতে হাঁটতে কখন হঠাৎ শুনতে পাবে, হয়ত একটা মাঠের মাঝখানে কিংবা কোন একটা পথের বাঁক নিতে, এই তার আপন দেশ আরম্ভ হল, তার নিশ্চিন্তের দেশ, তার সম্মানের দেশ।

'পথ পাচ্ছি না কেন বলতে পার?' সঙ্গের একটা লোককে জিগগেস করলে রাইপদ।

'এখনো বেলা আছে কিনা, অসুবিধে হচ্ছে।' সঙ্গের লোকটা বললে। 'যেই আঁধার নামবে, রাত হবে, টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়বে চোরাকারবারীর দল, তোমাকে হাত ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। এ-অঞ্চলে রাতেই পথ জাগে, দিনের বেলাই ধু-ধু।'

হক ঘুরপথ, কিন্তু এসব ঘাসমাটি পাখি-পাখালি, যেটুকু বা দিনের আলো আছে, যেটুকু বা গাছের ছায়া, এসব কি তার পর? মুখের কথা বললেই কি কেউ পর হয়?

'পা চালাও হে—' সঙ্গের লোকটা হেঁকে উঠল।

হ্যাঁ, পা চালাও, বলে উঠল গাছগাছালি, জল-মাটি, মেঘ-বাতাস। পালাও, পালাও, আমরা তোমার কেউ নই। তুমি চলে যাও তোমার নিশ্চিন্তের দেশে, তোমার সম্মানের দেশে।

যতক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে না পারছ, কিসের তোমার খেত-নদী, কিসের

তোমার ফুল-ফসল। যতক্ষণ শান্তিতে ঘুম না আসে মাটিকে মায়ের আঁচল বলে ভাববে কী করে?

প্রথমে এসে উঠেছিল শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে। কারু কোনো এলাকা নেই, আব্রু নেই, ওয়াড়-ঢাকনি নেই, ছাইয়ের গাদায় একপাল বেরাল-ছানার মত। তারপর জায়গা পেয়েছে ক্যাম্পে-কলোনিতে। ডোল পাচ্ছে বটে কিন্তু কাজ জুটছে না। কাঠ-টিন-বাঁশের ঘোরপ্যাঁচ দিয়ে তৈরি একটা গর্ত পেয়েছে, কিন্তু সাধ্যি নেই ঝড়-জল রোখে, রোগব্যাধির মুখোমুখি হয়। দু দুটো ছেলেমেয়ে মরেছে ভুগে ভুগে।

'দেশে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখ না, বাড়িঘর বেচে আসতে পার কিনা।' বললে ঠাকুরদাসী।

সেই আমাদের আস্তমস্ত ঘর। নিটুট চালবেড়া।

যদি কিছু দাম পাও। তা দিয়ে যদি একখানা বাড়ি তুলতে পার এখানে। ভিক্ষে দিয়ে দিয়ে অকর্মণ্য করে ফেলেছে। যদি তখন কাজ জোগাড় করতে আগ্রহ হয়। কাজ করবার ইচ্ছে হয় কার? যে জানে, ক্লান্ত হবার পর আমার বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। ঘর যার একটা কাঠ-টিনের হিজি-বিজি, শুতে গেলে যার পা টান করবার জায়গা নেই, তার কাজ করবার স্পৃহা হবে কোত্থেকে? কোলকুঁজো হয়ে বস, হাঁটু দুমড়ে শোও। থাক শুয়ে-বসে। আর ডোল নাও। ডোল না পেলে মিছিল কর।

অনেক দৌড়ঝাঁপ কসরত করে পৌঁছল বাড়িতে।

বাড়ি? বল, কী বলব বাড়ি ছাড়া?

গাঁতায় চাষ করত যে ছলিম শেখ, সেই দখল করে আছে। তুমিই কিনে নাও না বাড়িখানা। বলি, দর দেবে কত?

নাকের পাশে এক ডেলা মাংস ফুলিয়ে হাসল ছলিম শেখ। চলেই যখন গিয়েছ দেশ ছেড়ে, তখন আর বাড়ির মায়া কেন? ও ত আমার অমনিই হয়ে গিয়েছে।

আগ বাড়িয়ে গিয়েছিল দু-তিনজন মোড়ল-মুন্সির বাড়ি। বললে,

'কবালা করে কেউ নাও কিছু দাম দিয়ে, তারপর স্বত্বের জোরে বেদখল কর ছলিমকে।'

লেখাপড়ায় অনেক হ্যাঙ্গাম। যে যেমন পেয়েছ তাই নিয়ে শান্তিতে থাক।

আমি আবার কী পেলাম?

তোমার নিশ্চিন্তের দেশ, তোমার সম্মানের দেশ।

দোরে দোরে ঘুরল রাইপদ, সকলের মুখেই ঐ এক কথা। তা ছাড়া কবালা করেই বা লাভ কী। টাকা কি নিতে পারবে ট্যাঁকে গুঁজে? সে আরো কষ্ট। ছেলেকে যমে নিলে তবু সয়, চোরে নিলে সয় না।

তবে খালি হাতে ফিরে যাব?

না, তিনখানা মাদুর কিনে চলেছে।

স্যাঁতসেঁতে মাটিতে চট বিছিয়ে শোয়া চলে না। কখানা মাদুর পেলে ভাল হয়। একখানা বাড়তি হলে পাততে পারে সামনের মাটি-টুকুতে। সেই তার দাওয়া, সেই তার উঠোন।

'কী হে, চলেছ যে হন হন করে। বলি বগলের তলায় ও কী?' মাদুর ধরে কে টান মারল পিছন থেকে।

নিশ্চিন্তের দেশে কখন পৌঁছে গিয়েছে রাইপদ, কিন্তু পিছনে এখনো রয়েছে সাপের কিলবিলি। সাপ সব দেশেই সাপ। সর্বত্রই ওদের সমান ফণা, সমান ছোবল।

'তিনখানা মাদুর।' পিছন ফিরল রাইপদ।

'ডিউটি না দিয়ে চলেছ কোথায়?' কাস্টমের পিওন বলরাম চোখ পাকাল।

'এর আবার ডিউটি কী! এ ত আমি ব্যবসা করতে যাচ্ছি না। নিজের ব্যবহারের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি—'

'যার জন্যে নিয়ে যাও, ডিউটি লাগবে।'

গলা ঝাপসা করল রাইপদ। 'কত?'

চারদিকে তাকাল একবার বলরাম। বললে, 'ছ আনা।' বলে চোখে একটা ঝিলিক মারল।

সেই এক ঝিলিকেই ডিউটি তার সঠিক চেহারা নিলে।

এ পর্যন্ত অনেক গুনাগার দিতে দিতে এসেছে। আর বিপদ বাড়িয়ে লাভ কী। দিয়ে দিই ছ আনা।

পকেটে একটা পাকিস্তানী আধুলি। সেটাকে তবে ভাঙিয়ে দাও।

'আমি আছি।' মুকুন্দ এগিয়ে এল। 'আমি টাকা ভাঙাই। এই আমার ব্যবসা। তোমার এই আধুলি থেকে পিওনকে ছ আনা দেবে? বেশ, তাহলে বাকি দু আনা আমার।'

'তোমার কেন?'

'আমার বাটা।'

তাও ত ঠিক। তাহলে আর আধুলির মায়া করে লাভ কী? তোমরা দুজনেই নাও ভাগ করে।

'তা কী করে হয়?' মুকুন্দ টানল হাত ধরে, 'আমি কেন দিতে যাব পিওনকে? তোমার ইচ্ছে হয় তুমি দেবে। আমার সাফ ব্যবসা। আমি শুধু টাকা ভাঙাই। বাটার লেনদেন করি।'

আধুলির বিনিময়ে ছ আনা পয়সা, তিনটি দু আনি, মুকুন্দ দিল রাইপদকে।

আবার তাই, তিনটি দু আনিই রাইপদ দিয়ে দিল বলরামকে। বাবা, ছাড়ো মাদুর। বাড়ি যাই। শুকনো বিছানায় শুই গিয়ে গোল হয়ে।

কিন্তু ও কী, ওখানে ঐ দাঁড়িয়ে কে?

আগে বুঝতে পারেনি বলরাম। একটা হাফশার্ট পরা যুবক সাইকেলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পথের উপর। এমনি কত লোকই ত কত ফিকিরে আনাগোনা করে এ-অঞ্চলে। তাদেরই কেউ হবে হয় ত। লক্ষ্যের মধ্যেও আনেনি। কিন্তু সে না চিনলেও আউটপোস্টের মেজবাবু ঠিক চিনেছে। কোত্থেকে ছুটে এসে মেজবাবু হঠাৎ সেই সাইকেলধারীকে ঠকাস করে এক সেলাম ঠুকে বসল।

বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেল বলরামের। তাড়াতাড়ি দু আনি তিনটে ফিরিয়ে দিতে গেল রাইপদকে।

'কেন, কী হল ?'

'না, বাবা, দরকার নেই।' রাইপদর হাতের মধ্যে জোর করে গুঁজে দিল বলরাম। চোখের কোনায় ছোট্ট আরেকটি ঝিলিক মেরে বললে, 'এখন ত ফিরিয়ে নাও, পরে দেখা যাবে।'

মুকুন্দ হাসতে লাগল দাঁত দেখিয়ে।

একটা মুহূর্তের ছোট্ট একটা ভগ্নাংশ। শকুনের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল পিনাকী। ছদ্মবেশে মহকুমার পুলিশের মাথাল।

'কী হচ্ছে ? দেখে ফেলেছি, ধরে ফেলেছি। ইনস্পেক্টরবাবু, য়্যারেস্ট করুন।'

প্রায় কেঁদে ফেলল রাইপদ। কত বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি, কত ঝড়বৃষ্টি মাথার করে, কত দুঃখেকষ্টে। তারপর তিনখানি কাটিঘাসের মাদুর নিয়ে চলেছি বাড়িতে। ভিক্ষে করে আনিনি, কিনে এনেছি। তারপরে এই জুলুম। গোদের উপরে আবার এই বিষফোঁড়া।

'না, না তোমার দোষ কী। দোষ এই পিওনটার। পিওনটা ঘুষ নিয়েছে।'

'বা, ঘুষ নিলুম কোথায় ?' হাঁ করে রইল বলরাম। 'ওর আধুলির চেঞ্জ ওকে ফিরিয়ে দিলুম মাত্র।'

'আধুলির চেঞ্জ ?' গর্জে উঠল পিনাকী। 'আমি সব দেখেছি। তুমিও এবার দেখবে।' মেজবাবুকে উদ্দেশ করে বললে, 'ওর, তোমার নাম কী, রাইপদর একটা স্টেটমেণ্ট নিন, কেস স্টার্ট করে দিন।'

'বা, এ কী করে ঘুষ নেওয়া হল ?' বলরাম এর-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল, 'ঘুষ নিলুম ত আমার কাছে পয়সা কোথায় ? ওর পয়সা ত ওর হাতে—'

'পরে ফিরিয়ে দিলে কি হয় ? তার আগেই অপরাধ হয়ে গেছে।

গোবধ হয়ে গেছে, তারপর জুতো তৈরি করে দিলে কিছু হবার নয়।'

এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল পিনাকী।

কিন্তু কে কে দেখেছে? সাক্ষী কোথায়?

দুটো ছোকরা এগিয়ে এল। একজন চায়ের দোকানের বয়, আরেকজন পথচলতি লোক, এসেছিল ব্যবসার তদারকে।

একজন সম্ভ্রান্ত কেউ জোটে না?

মেজবাবু আরেকজনকে নিয়ে এল। ইনি ডাক্তার। গাঁয়ের ডাক্তার। হাতুড়ে।

তা হক। চিকিৎসা যখন করে, তখন নিশ্চয় সম্মানিত।

আমরা সবাই দেখেছি।

'আপনি সব তবে ব্যবস্থা করুন।' ইনস্পেক্টরকে হুকুম করে সাইকেলে বেরিয়ে গেল পিনাকী।

রাইপদকে কাগজ-কলম এনে দেওয়া হল। 'লিখতে পার?'

'ধরে বেঁধে নামটা সই করতে পারি। আপনিই লিখে নিন।'

লম্বা বিবৃতি দিতে বসল। কী কষ্টে আছে, কী তার ঘরদোরের চেহারা, কিবা তার রুজিরোজগারের দৈন্য, এই সব পাঁচ কাহন। লোনের টাকা কী করে মেরে দিয়েছে দালালে, কাজ দেবে বলে কে ঠকিয়ে নিয়ে গিয়েছে বউয়ের গায়ের শেষ গয়নাটুকু, তারই ফিরিস্তি—

'এ-সব মহাভারত লিখে কী হবে?' মেজবাবু বিরক্ত হয়ে উঠল, ঘটনা যা ঘটেছে শুধু সেইটুকু বল।"

'বলছি, তারপরে এই উৎপাত। দঁকে হাতি পড়লে বকেও ঠোকর মারে। কেউ টানছে জমি ধরে, কেউ টানছে ঘরের বেড়া ধরে, আর ইনি টানছেন মাদুর ধরে!'

সব পষ্টাপষ্টি বলল রাইপদ। অনেক সয়েছি জুলুম, আর নয়।

'হ্যাঁ, আমি দেখেছি।' বললে, পালান, চায়ের দোকানের ছোকরা।

"দিব্যি হাত পাতল, হাত গুটোল।" বললে দাশরথি, ব্যবসার খাতিরে যে আনাগোনা করে।

'দিব্যি চোখ ঠারল।' বললে ডাক্তার।

'আর আমার হাতে এই জলজ্যান্ত প্রমাণ।' মুকুন্দ এগিয়ে এল। বললে, 'সেই বাটার দুআনি।'

'তবে এবার সব থানায় চলুন।'

'আবার থানায় কেন?'

'সেখান থেকেই ত তদন্তের শুরু হবে। প্রথম এজেলা হবে। হবে সাক্ষীদের জবানবন্দি।'

সাক্ষীদের নিয়ে রাইপদকে নিয়ে মেজবাবু বাস্এ করে থানায় এল। কে কী দেখেছ সাক্ষীরা, এবার বল সব বিতং করে।

'আমার মাদুর কখানা?'

'ও ত আলামত হয়ে গেল। মামলায় একজিবিট হবে।'

'মাদুর কখানা বাড়ি নিয়ে যেতে পাব না?'

'আগে মামলার নিষ্পত্তি হক, তারপরে। আর ঐ দুআনি তিনটেও দিয়ে দাও। কোন তিনটে দুআনি ঘুষ নিয়েছিল, তাও মার্ক করে রাখতে হবে।'

'বা, ও ত এখন আমার নিজের হাতে, নিজের পকেটে।'

'তা হক, মামলায় দেখাতে হবে ত। ঘোড়া নেই চাবুক চলতে পারে, পয়সা নেই ঘুষের মামলা চলতে পারে না।'

ছ আনা পয়সাও গেল।

শূন্য হাতে ফিরল রাইপদ।

'কে?' ছায়া দেখে চমকে উঠল ঠাকুরদাসী।

'ফিরেছি।'

'কিছু আনতে পারলে?' ঠাকুরদাসী উছলে উঠল।

'শুধু কপাল, শুধু কপাল এনেছি সঙ্গে।'

'যাক, ফিরেছ যে এই আমার ঢের। বস, জিরোও।' একটুখানি চট বিছিয়ে দিল। কী একটা কাজের পিছু ধাওয়া করতে-করতে বললে, 'পরে শুনছি তোমার কথা।'

একটু তামাক খেতে ইচ্ছে করছে। সে বিস্তৃত সরঞ্জাম কোথায়? কোথায় সেই বিস্তৃত আলস্য? একটা বিড়ি ধরাল রাইপদ।

কিন্তু বিশ্রাম করবার কি সময় আছে?

চল, ওঠ, সাক্ষী দিতে হবে ঘুষের মামলায়।

এ আবার আরেক উৎপাত। দেখ দেখি আর রাজ্যে লোক পেল না আসামী ধরতে। শেষকালে একটা ছ আনা পয়সার ঘুষখোর। একটা নিরীহ গরিব পিওনের ভাতে হাত। কত রাজ্য লোপাট হয়ে গেল, কত পাহাড় ধসল, সমুদ্র শুকোল, সেদিকে নজর নেই, ধরতে ধর কিনা একটা চুনোপুঁটি।

দেখিয়ে দাও না, চোখে পড়ুক না কোথায় রুইকাতলা, দেখ না ধরি কিনা। কিন্তু চোখে যা পড়েছে তাই বা মুছে ফেলি কী করে? ছোট কাঁটাটাও ত তুলে ফেলতে হয়। পিনাকী সবাইকে বুঝিয়ে দিল। আগুনে হাত দিলে কচি ছেলেরও হাত পোড়ে। আইনে হাত দিলে গরিবগুর্বোরও রেহাই নেই। একটা বাড়ি বা দোকানের সিঁদ-চুরির কিনারা করতে পারিনি বলে হাতের কাছে সামান্য একটা পকেটমার পেলে ধরব না?

তা ছাড়া ছোঁড়া তীর ফেরে না। যখন ধরেছি, অপরাধ সপ্রমাণ করতেই হবে। তোমরা চল সব সদরে। রাহাখরচ পাবে, পাবে জলখাবার।

'আমি ঘুষ দিইনি।' হলফান জবানবন্দি করল রাইপদ।

সে কি কথা? জোঁকের মুখে নুন পড়েছে এমনি গুটিয়ে গেল পিনাকী।

'না। সমস্ত ব্যাপারটাই অন্যরকম। বলছি শুনুন। আধুলিটা ভাঙাতে দিয়েছিলাম মুকুন্দের হাতে। দু আনা বাটা রেখে ছ আনা পয়সা ওর ফেরত দেওয়ার কথা। পয়সাটা ভুল করে আমার হাতে না দিয়ে, দিয়ে দিল বলরামের হাতে। বলরাম সৎ লোক, সেই পয়সা, আমার পয়সাই আমাকে ফেরত দিল। পুলিশসাহেব মনে করলেন

বুঝি একটা ঘুষের কাণ্ড হয়ে গেল। আরশুলা আবার পাখি, খই আবার জলপান, ছ আনা আবার ঘুষ।'

'তবে ঐ যে দরখাস্ত লিখেছ, ঘুষ নিয়েছে বলরাম।'

'কী বলেছি আর কী লিখেছেন দারোগাবাবু, তা কী করে বলব।'

মুকুন্দকে ডাক।

'চোখের দোষে সব হলদে দেখেছেন সাহেব।' বললে মুকুন্দ। 'বলরাম ঘুষ নেবে কেন? আমি টাকা-ভাঙা লেনদেন করি। ও ত আমার এলেকা। আমার পয়সা রাইপদে, রাইপদের পয়সা বলরামে, বলরামের পয়সা আমাতে, আমার পয়সা রাইপদে এমনি একটা চক্কর চলছিল—' কী রকম একটা তালগোল পাকিয়ে দিল।

'তবে এই যে জবানবন্দি দিয়েছ দারোগাবাবুর কাছে?'

'আমাদের আবার জবানবন্দি। চটিজুতোর আবার ফিতে। কী বলেছি আর কী লিখেছে তার ঠিক কী'।

পালানকে ডাক।

'তুমি তখন চা দিচ্ছিলে না?'

'সেই চায়ের পয়সার দাম দিতে গিয়েই ত রাইপদ আধুলি ভাঙাল মুকুন্দের থেকে— নইলে আধুলি ভাঙাবার কী দরকার! রাইপদ বলল বলরামকে, দেখ ত খুচরোগুলো ঠিক আছে কিনা, চলবে কিনা—'

'আর তুমি দাশরথি?'

'আমার দোকানই বা কোথায়, ঘটনার জায়গাই বা কোথায়। দেখব কি, মাঝখানে একটা তেঁতুল গাছ। আমি কিছু দেখিনি।'

'আর তুমি ডাক্তার?'

'জল জোলাপ আর জোচ্চুরি এই তিন নিয়ে ডাক্তারি করছি। আমার আবার ঘুষ কী।'

একমাত্র সাক্ষী পিনাকী। মুখ ম্লান করে দাঁড়ল কাঠগড়ায়।

আমি দেখেছি, স্বচক্ষে দেখেছি। যেমন সব কিছুকে দেখছি চোখের উপর, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যেমন দেখে। তাতে এতটুকু ভুল

নেই। ঘুষ ঘুষ, তাতে ছ আনা ছ টাকা নেই। অপরাধী অপরাধী, তাতে গরিব-বড়লোক নেই। স্পষ্ট লিখিত জবানবন্দি করেছে রাইপদ। পড়ে শোনাবার পর নিজের হাতে দস্তখত করেছে।

করুক। কী বলতে কী শুনেছ কী লিখেছ তার ঠিক কী। তুমি একাই ঠিক দেখলে, আর এতগুলি লোক ভুল দেখল, এ-স্পর্ধার ভিত্তি কোথায়? আধুলি ভাঙাবার পয়সাকেই তুমি ঘুষ দেখেছ।

খালাস হয়ে গেল বলরাম।

কে জানে আমিও ভুল দেখেছি কিনা। মনে মনে বিচার করতে বসল পিনাকী। কিন্তু চোখের কোণে ঐ যে ছোট্ট কটাক্ষ, ঐ যে সঙ্কেতের ঝিলিক, সে কি কখনো ভুল হতে পারে?

'এবার পাব আমার মাদুর তিনখানা? সেই তিনটি দু আনি?' রাইপদ হাত জোড় করল।

'না, এখনো তার দেরি আছে। মালখানার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। লাগবে আরো কাঠখড়।' মেজবাবু হটিয়ে দিল।

আদালতের বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে রাইপদ। পাশে এসে দাঁড়াল বলরাম।

'এই দুটো টাকা তুমি নাও।' রাইপদর হাতের মধ্যে দুখানা একটাকার নোট গুঁজে দিল বলরাম।

জুলজুল করে তাকাল রাইপদ। বললে, 'কী, ঘুষ?'

'কথার গুণে তরি কথার গুণে মরি।' হাসল বলরাম, বললে 'ঘুষ নয়, বকশিস।'

দূর থেকে সব দেখছে পিনাকী।

রাইপদর চোখ পড়ল। এবার ঝিলিক ওর চোখে। টাকাটা বলরামকে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, 'না, এ ভিক্ষে। এ ঘুষের চেয়েও অধম।'

কে জানে, এও হয়ত, সমস্তই হয়ত পিনাকীর ভুল দেখা। কিন্তু চোখের সামনে জ্বলছে যে একটি সঙ্কেতের ঝিলিক, একটি কটাক্ষের টুকরো, তার আর ভুল কী।